গিয়েও তুমি যাওনি চলে আছ মোদের কাছে
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কার্য্য তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—

সচিত্র নূতন সংস্করণ

পদ্মরাণী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক—দেব-সাহিত্য-কুটীর।
৫৪।৭ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার।
"বি, পি, এম্স্ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

প্রীতি-উপহার
কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা
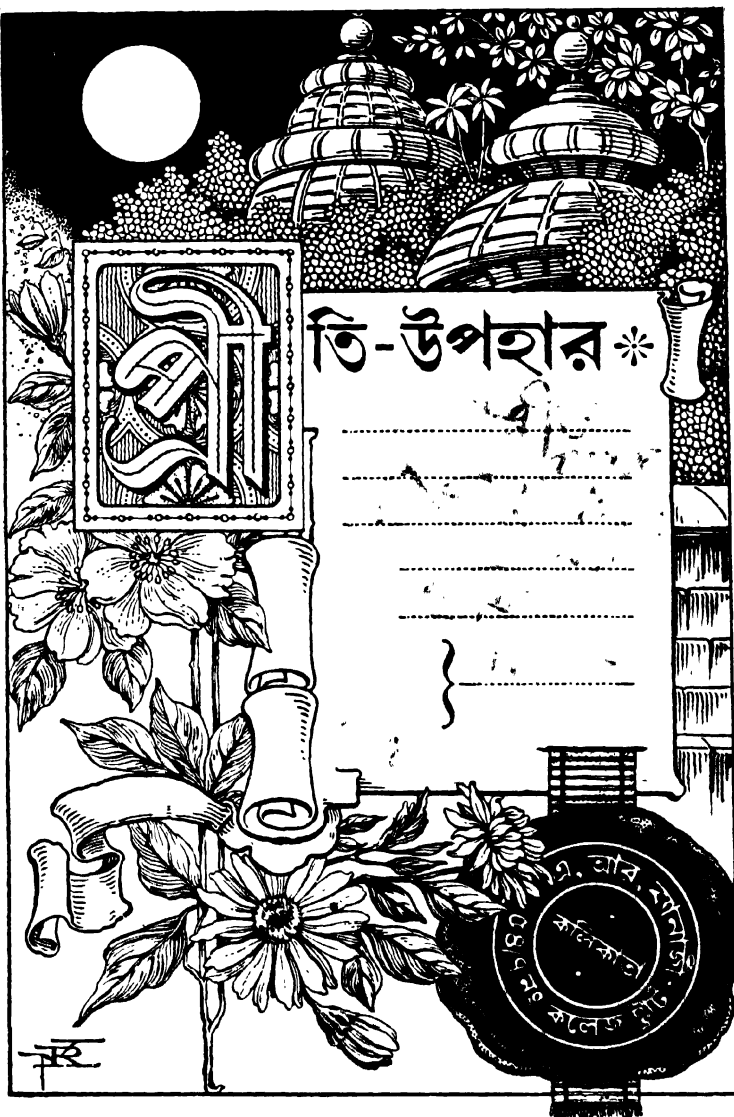
পদ্মরাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার ম্লান আঁধার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানির চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মরাণী ওরফে পদি, ব্রাহ্মণ বাড়ীর ধানভানা শেষ করিয়া অঞ্চলে কাঠা দুই চাল বাঁধিয়া ত্রস্ত পদে বাড়ীতে আসিয়া প্রাঙ্গন হইতে ডাকিল—উমা! ওমা উমা—উমারে!

অন্য দিনের মত ফুলের ন্যায় হাসি ছড়াইয়া উমাকে তাহার কাছে আসিতে না দেখিয়া তাহার প্রাণটা যেন একটু হাঁফাইয়া উঠিল, ব্যগ্র চঞ্চল কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাদেরে মিন্‌সে! গানেতেই নিজকে বেভ্‌ভুল করে রেখেছিস,—মেয়েটা গেল কোথায়?......

স্বামী—রূপো তখন দাবায় বসিয়া কেরোসিনের আলোর সাহায্যে জাল বুনিতে বুনিতে আপন মনেই গাহিতেছিল;—

"দিন গেল দিন দয়াময়ী
দীনের দিন কি যাবে না।
তোমায় কাতরে কিঙ্করে ডাকে
তবু দেখা দিলি না।"

"মাকে দেখব বলে ভাবনা
কেন করিস আর ?
সে যে তোমার আমার মা নয়
(মা) জগতের মা সবাকার।
ছেলের মুখে মা মা বাণী
শুনবে বলে ভবরাণী,
আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে
ডাকলে সাড়া দেয় না আর।"

রূপোর গানের এই সময় টুকুর মধ্যে পদ্ম তাহাকে আর কোনও কথা না বলিয়া উমাকে লইয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত অপরাহ্নের ধান ভানার গুরু পরিশ্রম এই কন্যার মুখ দেখিয়া সে তখন সবটাই ভুলিয়া গিয়াছিল।......

গান শেষ হইলে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া রূপো বলিল—সারা বিকেলটা ঢেঁকি ঠেঙিয়ে এলি পদ্ম, পুকুর ঘাট থেকে হাত মুখ ধুয়ে আয়......ঠাণ্ডা হ' একটু।

হাসিয়া পদ্ম বলিল—আর কি আমার কোনও কষ্ট আছে রে মিন্‌সে! আমার সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে—এই মুখখানা! দেখ্ দেখি আকাশে তো চাঁদ উঠেছে, এই মুখের কাছে কি আর চাঁদের রূপ......বলিয়াই একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় উমার মুখ খানিতে স্নেহের চুম্বন দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল।

অন্তরের মধ্যে বিপুল আনন্দ উপচাইয়া পড়িলেও, রূপো কিন্তু সেটা প্রকাশ না করিয়া বলিল—এতটা বেশী আঁকড়ে ধরিসনি পদ্মরাণি, তোর

পেটের নয় যখন, তখন ক'দিনই বা আর পরের জিনিষকে ধরে রাখবি বল্ ?

কথাটা শুনিয়াই পদির বুকের মাঝে একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল।... সত্যই কি একদিন তাহার বুকের ফুস্ফুস্টাকে এমনি করিয়াই ছিঁড়িয়া লইবে ? জগতের মানুষ কি এতখানিই হৃদয়হীন ? না না যাহাকে দশ দিনেরটী আনিয়া বুকের সমস্ত রক্ত জল করিয়া এত বড়টী করিয়া তুলিয়াছে সে, তাহাকে কি মানুষ হইয়া কেহ হৃদয়হীনের মত কাড়িয়া লইতে পারে ? আর লইতে আসিলেই বা দিবে কেন সে—তাহার কোল ছাড়া করিয়া ?......

তাহাকে এতখানি আনমনা ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া রূপো বলিল—কি এত ভাবচিস পদ্মরাণি ?

"এই তোর কথাটাই ভাব্‌চিরে মিন্‌সে" বলিয়া পদ্ম মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কাতরতা মাখা মুখখানি স্বামীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া পুনরায় কন্যার মুখের পানে তাকাইয়া বুকের মাঝে তাহাকে চাপিয়া ধরিল।...

রূপো বলিল—যেটা সত্যি, সেইটাই বল্লুম পদ্মরাণি !...কথাটা তোর বুকে বড্ড লেগেচে না ?

পদ্ম বলিল—তা লেগেচে বৈ কি একটু। আঁতের চেয়ে ছড়ের দরদ যে কতখানি তা তোর কথাতেই বুঝতে পেরেছি বেশ, কথাগুলো বুকের ভেতর যেন হাজার ঢেঁকির ঘা পাড়ছে মিন্‌সে !

হাসিয়া রূপো বলিল—যেটা বল্লুম সেটা সত্যিই যদি হয় তবে তারও এখনও দেরী আছে পদ্ম, তুই গা হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আয় !

পদ্ম কিন্তু উঠিবার জন্য এতটুকুও আগ্রহ প্রকাশ করিল না। স্বামীর

কথা সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাদেরে মিন্‌সে, আমি যদি না দিই! দশ দিনেরটী এনে মানুষ করে তুলেছি তো?... চাইতেও কি পারবে সে?

স্ত্রীর অন্তরের ঝড় বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া রূপো বলিল—আমি তোকে তামাসা করছিলুম পদু!...তুই যা—গা-হাত ধুয়ে আয়!

এতক্ষণ পরে সত্যই পদুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল—এতক্ষণ তবে এমনসব কথাগুলো বলছিলি কেন্‌রে মিন্‌সে? আমার এম্‌নি ভয় হয়েছিল!...তারপর উমাকে আর একবার স্নেহের চাপ দিয়া বলিল—একবারটী যা তো মা তোর বাবার কাছে, আমি আসচি এক্ষুণি।...

উমা ছুটিয়া গিয়া রূপোর পৃষ্ঠদেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পদু উঠিয়া দাঁড়াইতেই, দেখিল—তাহাদের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রামু গাঙ্গুলী!......দেখিয়াই পদু বলিয়া উঠিল—এসো গো দাঠাকুর! আঁধারে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

হাসিয়া রামু বলিলেন—উমার উপর তোমরা কতখানি স্নেহ ঢেলে দিয়েছ—তাই দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আর ভগবানের দয়ার কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হচ্ছিলুম দিদি!

রূপো তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানা আসন দিয়া উমাকে বলিল—তোর বাবারে মায়ি...যা কোলে যা!...

উমা কিন্তু তাঁহার কোলে যাইবার জন্য এতটুকুও আগ্রহ দেখাইল না। রূপো পুনরায় বলিয়া উঠিল—যা-মা-যা তোর বাবা যে!

উমা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যাঃ ও বুঝি বাবা?...সে আরও জোরে রূপোর গলাটা চাপিয়া ধরিল।...
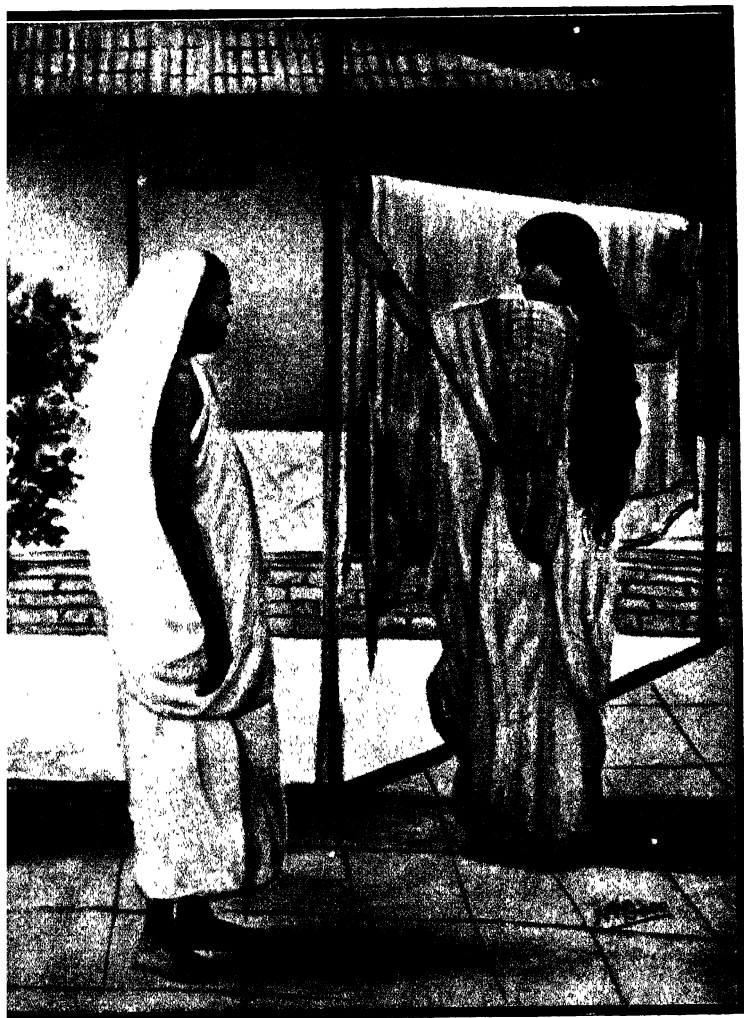
গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ—সদ্যস্নাতা উমা ও জয়ন্তীদেবী

রাসুর চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা স্নেহের জল গড়াইয়া পড়িল।...যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি আজ ইহাদের নিকট আসিয়াছিলেন, সেটা কিছুতেই ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। পদুর মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের ক্ষুধা দেখিয়া অন্তরের মধ্যে সেটাকে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ব্যথাতুর চিত্তের পরতে পরতে এই কথাটাই ধ্বনিত হইতে লাগিল—সকলের অনুরোধ রসাতলে যাক্—পিসিমার আকুলতা সাগরের অতল তলে ডুবিয়া যাক, পদুর হৃদপিণ্ড সে কিছুতেই ছিঁড়িয়া লইতে পারিবে না।

আসিবার মূল উদ্দেশ্য গোপন করিয়া রূপোর সহিত দুই চারিটা কথা বার্ত্তার পর রাসু তাঁহার অন্তরের মধ্যে এক রাশ চিন্তার মাতন লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।...

তাঁহার আজিকার হাবভাব নীচ জাত রূপোর প্রাণটার মধ্যে সন্দেহের একখানা ঘন মেঘের সঞ্চার করিয়া দিল। বাহিরে কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করিতে পারিল না, পাছে তাহার সন্দেহটা পদুর বুকে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া যায়! পর পর দুইটী সন্তানহারা হইয়া পদু যখন উন্মাদিনীর মত হইয়া যায়, ঠিক সেই সময়েই রাসুর স্ত্রী উমাকে দশ দিনেরটী রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহাদের জাতের আত্মীয় কুটুম্ব এমন কি তাঁহার পিসিমা পর্য্যন্ত এই রক্ত পিণ্ডটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এতটুকুও আগ্রহ দেখাইলেন না বরং পরাঙ্মুখতারই জেদ প্রকাশ করিলেন, তখন রূপো তাহার সদ্য পুত্রহারা পদুর কোলে এই মেয়েটিকে তুলিয়া দিয়া পত্নীর শোকটাকে কতকটা মন্দীভূত করিয়া দিয়াছিল।......বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের কতখানি তৃষ্ণা লইয়া পদু আজ উমাকে এত বড়টী করিয়া তুলিয়াছে—তাহার কোলছাড়া করিয়া যদি

গাঙ্গুলি এই মেয়েটিকে লইয়া যান, তবে পদ্মর অবস্থা কি হইবে—সেইটার চিন্তায় সে তন্ময় হইয়া গেল।...তাহার তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল—পদ্মর ডাকে। ব্যস্ত ভাবেই সে উত্তর দিল—কি বল্‌ছিস পদু!

—দা'ঠাকুর এরই মধ্যে চলে গেলেন, আর একটু বসিয়ে রাখ্‌লি নি কেন?

—রইলেন না পদু, থাকবার জন্যে বলেছিলুম অনেক।

হাসিয়া পদু বলিল—মেয়েটা তাঁর কোলে পীঠে গেল? হাজার হোক বাবা তো?

—"একেবারেই না পদু, বাবা বলে তাঁকে মানতেই চায় না" বলিয়া রূপো একবার হো হো হাসির মধ্য দিয়া পত্নীর কাছে নিজের অন্তরের সমস্ত ভাবটাকে লুকাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাস বিহারী ওরফে রাসু গাঙ্গুলী যে উদ্দেশ্য লইয়া আজ রূপোর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে উমার প্রতি পত্নর স্নেহের ফল্গু-প্রবাহ দেখিয়া সে উদ্দেশ্যটা কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। উপরন্তু অন্তরের মধ্যে তৃপ্তির সুধা-সাগর লইয়া তিনি তাঁহার বাড়ী-খানার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত পথটাই তাঁহার মনের মধ্যে নানা রকম ভাবে উঁকি মারিয়া দেখা দিতে লাগিল—আজ মাতৃ-স্নেহের যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আসিলেন তিনি, স্ত্রী জীবিত থাকিলে কি ইহার অধিক স্নেহ উমার সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া দিতে পারিত ?

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পিসিমা জয়ন্তি দেবী বলিলেন—কি হ'লো বাবা রাসু !—বলে এলি তা'দিকে—কবে আনবি মেয়েটাকে ?

দাবার উপর বসিয়া ধীর ভাবেই গাঙ্গুলী বলিলেন—না পিসিমা ! মুখ দিয়ে কথাটাকে বারই করতে পারলুম না।

অবাক দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর ফেলিয়া জয়ন্তি দেবী বলিলেন—সে কিরে রাসু ?...নিজের মেয়ে......

বাধা দিয়া রাস বিহারী বলিলেন—মেয়েটার উপর তার ভালবাসা আমাকে কথাটা বলতেই দিল না পিসিমা !...যতই তার স্নেহের পরিচয়

পেতে লাগলুম, তার ওপর মেয়েটার যতখানি নির্ভরতা দেখ্‌লুম, তাতে কথাটা বলব কি পিসিমা, সে দৃশ্য দেখে নিজেরই মনের মধ্যে আনন্দ উথ্‌লে উঠতে লাগল, যতই দেখতে লাগলুম ততই আত্মহারা হয়ে যেতে লাগলুম ;—কি স্নেহ দিয়েই যে মেয়েটাকে চেপে রেখেচে পিসিমা! বলিতে বলিতে নিজের আনন্দেই রাস বিহারী বিভোর হইয়া গেলেন। মুখ দিয়া তাঁর একটা কথাও আর বাহির হইল না।

একটু দীপ্ত কণ্ঠেই জয়ন্তি বলিলেন—চিরদিন তো এমন হাবা গোবা থাকলে চলবে না রাসু, নিজের মেয়ে......

বাধা দিয়া একটু দ্বিধা ভাবেই রাস বিহারী বলিলেন—নিজের বলে এতটুকুও বোধ হয় অধিকার নেই পিসিমা! মেয়ের বাপ আমি হলেও প্রকৃত বাপ মা তার—রূপো আর পদু। তুমি যদি দেখ পিসিমা, ঐ দু'জন কতখানি আগ্রহে, কতখানি আকাঙ্খা নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, তা হলে.....

বাধা দিয়া জয়ন্তি বলিলেন—তা কি আর জানি না বাবা! নিজের পেটে না ধরলেও দশ দিনেরটী নিয়েই তো এত বড়টী করে তুলেছে। ধানভানতে বেরিয়েছে, সেই কচি মেয়েটী কোলে নিয়ে, রাঁধতে হয়েছে তাকে কোলে করে, অসুখে তার......

—তবে পিসিমা, প্রকৃতই যে মায়ের আসনে বসে তাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে—কি করে তাকে বলি-বল দেখি—ও-জিনিষ তোর নয় পদু, আমায় ফিরিয়ে দে! সে এখন উমার মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে বসে আছে পিসিমা—তুমি আমি এখন আর তার কেউই নই।...

নিজের কথায় ধরা দিয়া জয়ন্তি একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এখন

তিনি বুঝিতে পারিলেন, রাসবিহারীর নিকট এতখানি সহানুভূতি সেই বাগ্দি দম্পতির প্রতি না দেখাইলেই ভাল হইত, তাহাদের উপর ইহার প্রাণ যতখানি দরদে ভরা তাহাতে রাসবিহারীর মত যদি সে প্রাণটাকে কোমল করিয়া তুলে, তবে সে উমাকে আর আনিবার নামও করিবে না। অথচ তাহাকে আনিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের বংশে যখন জন্মিয়াছে সে, নীচ জাতির সংস্পর্শে এত বড়টী হইয়া উঠিলেও, বিবাহ যখন ব্রাহ্মণের ঘরেই দিতে হইবে, তখন যে সংস্কারের মধ্যে সেই কচি মেয়েটী এখনও ডুবিয়া আছে, সেই সংস্কারটাকে দূর করিবার জন্য আনিতেই হইবে তাহাকে! তাহা না হইলে যে উপায় আর কিছুতেই নাই! বিবাহ যখন তাহার দিতেই হইবে তখন সেখানে রাখিলে আর কোনও ব্রাহ্মণই তাঁহাদের ঘরে উমাকে স্থান দিবেন না।

পিসিমাকে এতক্ষণ নীরব চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে দেখিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি এত ভাবছ পিসিমা? তুমিই বল দেখি—একটা রাক্ষসের মত মায়ের কোলছাড়া করে তার মেয়েকে কি করে টেনে নিয়ে আসি?

তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জয়ন্তি বলিলেন—কিন্তু আন্‌তেই হবে রাসু!

এতখানি বুঝাইয়া বলিবার পরও পিসিমাকে তাঁহার মতটাকেই জোরের সঙ্গে ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া রাসবিহারী মনে মনে অনেকখানি অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—কেন?

শান্ত শীতল কণ্ঠে পিসিমা বলিলেন—না আন্‌লে যে উপায় নেই বাবা!

—কিন্তু পিসিমা! এই রকম ধরণে আনার ভেতর কতখানি অধর্ম্ম, কতখানি মহাপাপ লুকোন থাকতে পারে—সেটা ভেবে দেখেছ কি?

—যতখানি মহাপাপই হোক না কেন, তবুও—

একটু উগ্র কণ্ঠেই রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন—আন্‌তে হবে—কেমন?

—হাঁ বাবা!

বিরক্তির হাসি হাসিয়া রাসবিহারী বলিলেন,—এখন তাকে আন্‌বার জন্যে যতখানি ব্যস্ত হয়ে উঠেছ পিসিমা, দশ দিনেরটী যখন সে মা মরা হল, কৈ তখন ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এর একশ ভাগের—না-না লক্ষ ভাগের এক ভাগও চেষ্টা করনি, অথচ যার বুক হতে তাকে ছিনিয়ে আন্‌তে বলছ—সেইই তখন অন্তরের সমস্ত একাগ্রতা দিয়ে তাকে তার বুকে তুলে নিয়েছে! একটী দিনের জন্যেও তা হতে নামিয়ে দেয়নি!

জয়ন্তি কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু রাসবিহারী সেটা শুনিবার জন্য এতটুকু আগ্রহ না দেখাইয়া রাজ্যের বিরক্তি অন্তরের মধ্যে পুরিয়া দাবা হইতে ঘরখানার ভিতর যাইয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাসবিহারীর এইভাব জয়ন্তিকে কম আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিল না! হতভম্বের মত বসিয়া তিনি এই কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন—রাসু কি? মানুষ হয়ে কি করে জন্মাল সে! নিজের মেয়েকে আনবার জন্যে প্রবৃত্তি যার এতটুকু সাড়া দেয় না—সে কি বাপ!...ছিঃ!

এতক্ষণ দুইজনের কথাবার্ত্তায় যা-ও বা সুরের এতটুকু গুঞ্জনবাড়ী-খানার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এক্ষণে এই দুই পিতৃস্বসা ও ভ্রাতুষ্পুত্র

নিবিড়তম চিন্তার মধ্যে পরস্পরকে ডুবাইয়া দেওয়ায়, বাড়ীখানা যেন আরও নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল !...

রাসবিহারী ভাবিতেছিলেন—ইহারা কি মানুষ ? তাই যদি হবে, তবে মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেবার জন্য কেন এদের এতখানি আগ্রহ ?

আর পিসিমা ভাবিতেছিলেন—জগতে এমন মূর্খ কেউ কি থাকে যে, নিজের সন্তানকে আনবার জন্য এতটুকু আগ্রহ দেখায় না? কি ধাতু দিয়ে গড়া সে ? ভগবান কেন তাকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ?

তাঁহাদের দুইজনের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া গেল—পুরোহিত মতি ভট্চাযের আগমনে।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া জয়ন্তির প্রাণটা একটু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলে ভট্চায তাহাতে বসিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আর অন্ধকারময় ঘরের মধ্যে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলেও, রাসবিহারীর বুকের মধ্যে তোল পাড় করিয়া উঠিল—তাঁহাকে অধর্ম্মের পথে টানিয়া আনিবার জন্য পুরোহিতের মুখে শাস্ত্রের বড় বড় কথা শুনিবার ভয়ে...

জয়ন্তিকে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—খুকিকে নিয়ে আসবার কি করলে জয়ন্তি দিদি ?

হতাশভাবে জয়ন্তি বলিলেন—কি আর করবো পুরুতদা ? যার মেয়ে, সেই যে তাকে আনবার নামওমুখে আনে না ! এত বলছি......

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন—কিন্তু আর দেরী করা চলবে না দিদি ! এর পর তাকে আনতে গেলে সমাজের মধ্যেও হয় তো একটা

গোলমাল হয়ে পড়বে। এখনও তার জ্ঞান ভাল রকম হয়নি, এখন আনলে ততটা কেউ বোলে কিছু কর্‌তে পারবে না।

জয়ন্তি বলিলেন—সে কথা অনেকবারই তাকে বুঝিয়ে বলেছি দাদা! কিন্তু কি যে প্রাণ, তার কিছুতেই যে তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না! তুমি একবার দেখনা দাদা, যদি মত করাতে পারো।

পুরোহিত বলিলেন—মত করাতেই হবে দিদি, তা না হলে যে উপায় নেই!...কোথা গেছে সে?

—ঘরে বসে রয়েচে,...তুমি আসবার একটু আগে এই কথাই হচ্ছিল।

পুরোহিত মহাশয়ের ডাক শুনিয়া রাসবিহারী আশঙ্কার গুরু বোঝা অন্তরের মধ্যে লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইতেই, তিনি বলিতে লাগিলেন —বুদ্ধিমান হয়ে এমন অবুঝের মত কেন কাজ করছ বাবা! রাখবার যখন কোনও উপায়ই নেই, আনতেই যখন হবে, তা আজই হোক, কালই হোক আর দুদিন পরেই হোক, তখন এত বড় কাজটাকে এতখানি অব-হেলা করছ কেন?

ধীরভাবেই রাসবিহারী বলিলেন—অবহেলা আমি ইচ্ছা করে করছি না পুরুতমশাই! ঘটনার স্রোত আমাকে বলতে দিচ্ছে না। যখনই কথাটা বলতে সেখানে ছুটে যাই, তখনই কে যেন জীভ্‌টাকে টেনে ধরে,—বলতে দেয় না।

হাসিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—সেটা তোমার অন্তরের দুর্ব্বলতা রাসু! কিন্তু দুর্ব্বলতা দেখাবার তো এ সময় নয় বাবা!

—সবই বুঝি পুরুতকাকা! উমা আমায় নিজের মেয়ে! ঘটনাস্রোত তাকে নীচ জাতের বাড়ী রাখতে বাধ্য করেছে, কিন্তু তাই বলে কি স্নেহ

আমার নেই? না কাছে রাখ্‌বার জন্তে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে না?

শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—তবে এতখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ কেন বাবা? তোমার জিনিষ, তুমি ঘরে আনবে......

বাধা দিয়া রাসবিহারী বলিলেন,—কিন্তু কথা কি জানেন পুরুত কাকা! যে তার বুকজোড়া স্নেহ দিয়ে মেয়েটাকে এত বড়টী করে তুলেছে, তাকে কি করে বলব......

—দুর্ব্বলতায় কোনও কাজ হয় না বাবা! এতদিন ধরে তাকে মানুষ করেছে, কিছু টাকা-কড়ি দিয়ে তাকে সুখী করেই নিয়ে এস, সেও যখন জানে—বামুনের মেয়েকে বেশীদিন রাখতে পারবে না সে, তখন নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে।

রাসবিহারীর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। এই ধর্ম্মভীরু লোকটীর এইটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য মনে হইল, অর্থের বিনিময়ে মা তার সন্তানকে কেমন করিয়া অপরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে! হইতে পারে পদ্ম তাহাকে গর্ভে ধরেনি, কিন্তু লালন পালনের যে গুরু পরিশ্রম মেটাতে সে......

তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িয়া গেল জয়ন্তির কথায়। তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া জয়ন্তি বলিলেন—এর দ্বারা হবে না পুরুত দা! কাল আমিই পদ্মকে ডাকিয়ে সব বুঝিয়ে বলবো। আর দয়া করে তুমিও একবার রূপোকে ডাকিয়ে বলে দিও ...

রাসবিহারী চমকাইয়া উঠিলেন। ব্যস্তভাবেই বলিয়া উঠিলেন—না

পিসিমা, তোমাদিকে কোনও কথা বলতে হবে না, আমিই বলবোখ'ন, কি ভাবে বলতে তোমরা কি ভাবে বলে ফেলবে...

জয়ন্তি বলিলেন—কিন্তু তুই যে বলতে পারবি...

—ঠিক পারব পিসিমা, কাল বরং দেখে নিও—আমি ঠিক তাকে বুঝিয়ে নিয়ে আসবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—হ্যাঁরে মিন্সে!

হুঁকার ছিদ্র হইতে মুখটা তুলিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া রূপো বলিল—কেনরে পদুরাণি!

—একটা কাজ করলে হয় না?

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রূপো বলিল—কি?

পদি বলিল—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে মেয়েটা আটে পড়ল তো?

—তা পড়ল বৈকি পদু!

—এইবার ওকে পাঠশালায় দিলে হয় না?

পদির মুখের দিকে চাহিয়া রূপো বলিল—ছোট ঘরে ওসব......

তাহার কথায় বাধা দিয়া সহাস্যে পদি বলিল—এই রে মিন্সে, আমার চেয়ে তোকেই বেশী জড়িয়ে ফেলেচে!

স্ত্রীর কথায় রূপো না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সেই ভাবেই বলিল—তুই কি মনে করিস পদুরাণি, বুকের ভেতর আমার স্নেহ বলে কোনও কিছু নেই?...পেছন দিক দিয়ে যখন গলা জড়িয়ে ধরে...

বাধা দিয়া সুমধুর হাস্য ছড়াইয়া পদি বলিল—অতটা কিন্তু ভাল নয়রে মিন্সে! নিজের পেটের দু'টোকে যম এসে একটা একটা করে

ছিনিয়ে নিলে, আর এটাকেও একদিন রাসু গাঙ্গুলি এসে বাঘের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

শান্ত শীতল কণ্ঠে রূপো বলিল—এতই যদি বুঝিস পদ্মরাণি, তবে আবার পাঠশালে দেবার কথা কেন?

—আহা সেটা কোত্তব্যরে মিন্সে—কোত্তব্য! তা না হলে তুই কি আমাকে এতটাই পাগল পেয়েছিস, যে, ঐ পরের মেয়েটার মায়ায় বাঁধা পড়ে আমি আমার এহো-পরকাল নষ্ট করব? সে পদি-বাগ্দিনী আমি নই!

স্ত্রীর কথায় রূপো একবার তাহার প্রোজ্জ্বল সহাস্য দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর ফেলিল—একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

পদি বলিল—তা হলে দিবি তো ওকে পাঠশালে?

—তোর হুকুম কি আর অমান্য করতে পারি পদ্ম! কালই সেটার ব্যবস্থা করে দেবো।

আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে পদ্ম বলিল—কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবচি মিন্সে, শুধু পাঠশালে কি আর তেমন ন্যাকাপড়া হবে? ঘরেও একজন ম্যাষ্টার রাখতে হবে।

—কি বলছিস পদ্ম?...তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

—কোন্‌খানটায় দেখলি?

—গরীব বাগ্দির ঘরে ম্যাষ্টার রাখবার পয়সা......

রূপোর পরের বলিবার কথা বুঝিয়া লইয়া পদ্ম বলিল—পয়সার জন্যে ভাবনা কিরে মিন্সে? কাল থেকে আমি শুষ্‌নি কলমি শাক বেচব, চাট্‌নি জালে চুনো-চানা মাছ ধরে বেচলেও চার পাঁচ আনা দিন পাওয়া যাবে, তাতে কি আর ম্যাষ্টার রাখা চলবে না?

স্ত্রীর মুখের উপর আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলিয়া রূপো বলিল—আমাকে তখন জড়িয়ে পড়বার কথা বলছিলি না পদ্ম? কিন্তু নিজে......

—বয়ে গেছে না জড়িয়ে পড়তে! সে মেয়ে পদি নয়, বুঝলি? তবে কি জানিস? হাজার হোক ভদ্দর নোকের মেয়ে, বিয়ের সময় কেউ না বলে—পদিবাগ্দি মেয়েটাকে বাগ্দির মতই গড়ে তুলেছে।...তাকে দেখে সব্বাই সুখ্যেত করলে, বুকখানা দশ হাত হয়ে উঠবেরে মিন্সে, তা না হলে আর আমার কি বল্না?

রূপো বলিল—তার চেয়ে আর এক কাজ কর না—পদ্মরাণি!—যার জিনিষ তাকে দিয়ে দে না! বিয়ের সময় যদি তাকে দিতেই হয়, তবে মায়ার ওপর আর মায়া বাড়িয়ে দরকার কি?...মায়ার হাত হতে...

তাহার কথাটা আর বলা হইল না, এতটুকু কথাতেই যখন সে দেখিতে পাইল—পদ্মর চোখের কোণ জলে চক্ চক্ করিয়া উঠিয়াছে, তখন বাকি কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বলিয়া উঠিল—বুকে বড্ড বাজলো, না রে পদ্মরাণি?

পদ্মরাণী কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না, কি জানি কোথ হইতে অশ্রু আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।...সে তাড়াতাড়ি কাজের অছিলায় ঘর খানার ভিতর প্রবেশ করিল।......

রূপোর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া ডাকিল—পদ্ম!

গৃহ মধ্য হইতে পদ্ম বলিল—কেন্ রে?

—দেখে যা—শিগ্গীর!

পদ্ম বাহিরে আসিতেই, আকাশের পশ্চিম কোণটা দেখাইয়া রূপো বলিল—কি ভয়ানক মেঘ করেছে দেখ পদ্ম, বাতাসও বন্ধ হয়ে গেল! ঝড় আস্‌বে বোধ হয় রে!

একটু ব্যস্তভাবেই রূপো বলিয়া উঠিল—খুব বেশী ঝড় হ'লে যে ঘরের চাল থাক্‌বে না পদ্ম।—উড়িয়ে নিয়ে যাবে...কি হবে?

—"সে ভাবনা তুই ভাব" বলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা যে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—গেল কোথা?—তুই বোস্‌, আমি তাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

বলিয়াই সে বাহির হইবার জন্ম দাবা হইতে নীচে নামিতেই, দেখিতে পাইলে উমা আর দুলো, তাহাদের বহিয়া আনিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেকগুলি আম তাহাদের বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যথাশক্তি সেই দিকেই দৌড়াইয়া আসিতেছে, কিন্তু বোঝার ভার তাহাদের দৌড়িবার শক্তিটাকে অনেক পরিমাণে শ্লথ করিয়া দিতেছে!

পদ্ম তাড়াতাড়ি উমাকে কোলে লইয়া তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিল—এই সারা দুপুরটো কেবল গাছতলায় ঘুরে বেড়ান হয়েছে? পাজী মেয়ে! কে তোকে আম কুড়ুতে বলেছিল?

ভয়ে উমা চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিতেই, দুলো বলিয়া উঠিল—বা রে আমরা বুঝি কুড়ুতে গেছলুম?

—কুড়ুসনি ত আপনি এগুলো তোদের আঁচলে এলো?

উমা বলিয়া উঠিল—বামুন বাবা যে দিলে—

পদ্মর বুঝিতে বাকি রহিল না—এই বামুন বাবা কে—তবুও প্রশ্নের ছলে জিজ্ঞাসা করিল—বামুন বাবা আবার তোর কে রে?

উমা বলিল—বাঃ! জানিস না বুঝি? সেই যে সে দিন রাত্তিরে এসেছিলো, আমাকে দেখতে পেয়ে কত আদর করলে, আজ হাটবার বলে ভোবলা ময়রা পাঁপর ভাজছিল—কিনে দিলে, কোলে করে বাড়ী নিয়ে গেলো, কত আম-জাম খাওয়ালে আর এই এত গুলো আঁচলে বেঁধে দিয়েছে।

তাহার মুখে স্নেহের চুম্বন দিয়া পদ্ম বলিল—ওরে পাজি মেয়ে, সে বুঝি তোর বামুন বাবা?

—তবে কে সে? বড্ড ভালবাসে কিন্তু...যাঃ মিছে কথা, আমার বাবা ত ঘরে রয়েছে।

নিবিড় স্নেহবেষ্টনির মধ্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বাটীর মধ্যে যাইয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিল—ওগো! উমা আমাদের তার বামুন বাবা চিনেছে।

লজ্জিত ভাবেই উমা বলিল—তারা যে বলে দিলে।

তাহার কথায় এই দুই স্বামী-স্ত্রী একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইল। তারপর রূপো বলিল—বামুন বাবা নয় মা, তিনি যে তোর বাবা!

"যাঃ" বলিয়া উমা তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেই, সে তাহাকে আদর করিয়া বলিল—হ্যাঁরে মা! তোর বামুন বাবা কি দিলে রে?

অঞ্চল হইতে আমগুলি দাবায় ঢালিয়া, দুইটী তাহার হাতে দিয়া বলিল—এদুটো খা বাবা তুই, সিঁদুরে গাছের আম—খুব মিষ্টি।

উমার এই স্নেহের আবদার রূপোর প্রাণটাকে আনন্দে ভরাইয়া দিলেও, সে তাহাতে ডুবিয়া যাইতে পারিল না, প্রবল ঝড়ের গুরু আশঙ্কা

তখন তাহার প্রাণের মধ্যে মাতামাতি সুরু করিয়াছিল, বলিল—রেখে দে মা, পরে খাবো'খন।

—না বাবা খা তুই।

হাসিয়া অন্যমনস্কভাবে রূপো বলিল—খাবো রে মা! খাব। রেখে দে এখন।

রূপোর আশঙ্কাটাকে সত্যে পরিণত করিয়া হঠাৎ পশ্চিমদিক হইতে একটা ভীষণ ঝড় তাহার রুদ্র মাতন লইয়া দেশটার উপর দিয়া বহিয়া চলিল!

রূপো ও পদুর প্রাণের মধ্যে তখন তাহাদের এই মাথা গুঁজিয়া থাকিবার যায়গাটার জন্য আশঙ্কার হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল, জীর্ণ-গৃহের অবস্থা যা, তাহাতে এই বাতাসের মুখে কতক্ষণই বা সে আত্মরক্ষা করিবে? হয়ত আর একটু সময়ের মধ্যেই চালখানা উড়িয়া যাইবে... তখন উপায়? এই দুধের মেয়েটাকে লইয়া কোথায় যাইবে তাহারা? আশ্রয় তাহাদের কোথা?

সারা অপরাহ্ন ঝড় ও বৃষ্টি পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য আড়ে হাতে চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরে যখন তাহারা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, প্রকৃতি তাহাদের এই মতি পরিবর্ত্তনে সারা দেশটার উপর তাহার হাসির বিমল ছটা ছড়াইয়া দিল, তখন রূপো শঙ্কিত প্রাণে দেখিল—ঘরের সমস্ত চাল উড়িয়া না গিয়া এক দিকেরই নষ্ট হইয়াছে,...প্রাণের মধ্যে একটু আনন্দ হইল—একেবারেই তাহারা নিরাশ্রয় হয় নাই, যেটুকু নষ্ট হইয়াছে সেটুকু ঠিক মত করিয়া লইতে কাল সকালে দুই চারটা তালগাছের পাতা কাটিলেই হইবে।

রাঁধিবার প্রয়োজনে দাবার এককোণে ভিজা উনুনটাকে জ্বালিবার জন্য তখন পদ্ম চুলার মুখে ফুঁ দিতে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছিতেছিল আর রূপো উমাকে কোলে লইয়া রাক্ষসীর দেশে রাজপুত্র যাইয়া কেমন করিয়া ফুলের মধ্যে অতল জলরাশি হইতে বাক্সে রক্ষিত ভোমরা-ভোমরী-রূপী তাহাদের প্রাণকে নষ্ট করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল—তাহারই গল্প বলিতেছিল, আর উমা ভাবোন্মত্ত হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া এক একবার বলিতেছিল—তারপর?

রূপোর গল্প বলিবার মধ্য পথেই রাসু গাঙ্গুলি আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হচ্ছে রূপো?

হাসিয়া রূপো বলিল—আর বলেন কেন দাদাঠাকুর! কিছুতেই ছাড়বে না, রোজ রোজ গল্প শোনান চাই, গল্পই বা পাই কোথা রোজ?

হাসিয়া রাসু বলিলেন—অনাটনও ত কিছু হয়নি,—খুব মায়ায় ফেলেছে বল?

—বলেন কেন দাঠাকুর! শুনবেন?—আজ বুঝি দুপুর বেলা আপনি ওকে আম দিয়েছিলেন, তারই দুটো মুখের কাছে ধরে বলে—'খা, সিঁদুরে গাছের আম ভা·রি মিষ্টি।'

উমার কিন্তু এতগুলো বাজে কথা আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। বলিল—তারপর কি হ'ল বল্‌না বাবা!—পাথরটা ভাসতে ভাসতে আসছিলো—তারপর?

রূপো বলিল—আজ থাক মা, কাল শুনিস্, তোর বাবা এসেছেন, দু'টো কথা কই।

রাসু বলিলেন—আচ্ছা রূপোদা তুমি বল—আমিও শুনি।

পদ্ম ততক্ষণ ভাতের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া দিয়া, তাহাদেরই কাছে আসিয়া বসিল।

রূপোর গল্প শেষ হইলে রাসু বলিলেন—হ্যাঁ রূপোদা! ঝড়ে কিছু নষ্ট হল তোমার?

—একদিকের ছাউনিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে দা ঠাকুর!

যে কথাটা বলিবার জন্য রাসু হৃদয়ের মধ্যে অস্থিরতা লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, সেই কথাটাকে অন্য ধরণে প্রকাশ করিবার একটা মস্ত বড় সুযোগ দেখিতে পাইয়া পুলকভরেই জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে এক কাজ কর না রূপোদা!

রূপো তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রাসুর মুখের উপর ফেলিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—আজ হতে চল রূপোদা—তোমরা আমার বাড়ী। মাথা গোঁজবার চালটা পর্য্যন্ত যখন উড়িয়ে নিয়ে গেল, তখন আর এখানে থাকবার দরকার নেই। আমার বাড়ীতে ব'সে ব'সে কেবল উমাকে রূপ-কথা শোনাবে।

হাসিয়া রূপো বলিল—তাকি পারি বাবু! ভাঙ্গা ঘর হলেও এটা যে আমার অট্টেলিকে!

রাসবিহারী কিছুতেই যখন তাঁহার স্বমতে আসিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার মনের মধ্যে দুর্ভাবনার রাশ কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিতে লাগিল, কি করিয়া যে আসল কথাটা তাহাদের নিকট খুলিয়া বলিবেন, চিন্তা করিয়াও ভাবিয়া পাইলেন না। অথচ না বলিলেও নয়।

তারপর আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ

লইয়া রাসবিহারি রূপোকে বলিলেন—পুরুত মশায় আর পিসিমা বলছিলেন রূপোদা......

বলিবার চেষ্টা করিয়াও আর পরের কথাটা বাহির করিতে পারিলেন না।

পদু বলিল—কি বলছেন দাঠাকুর? বলুন না?

রাসু বলিলেন—মেয়েটাকে......

পুনরায় তাঁহার কণ্ঠে বাধিয়া গেল, মুখ দিয়া তিনি কথাটাকেই বাহির করিতে পারিলেন না, বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়া যাহারা ইহাকে মানুষ করিয়াছে ,তাহাকে কি করিয়া তিনি ছিনাইয়া লইবার কথা প্রকাশ করিয়া বলিবেন?

রূপো কিন্তু তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—উমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ দা'ঠাকুর?

রাসবিহারী বলিলেন—পুরুত মশায় আর পিসিমা......

বাধা দিয়া রূপো বলিল—তা নিয়ে যাবেন, আপনার জিনিষ আপনি নেবেন তার আর কথা কি? তবে পদুর বুকে বড্ড লাগবে দা'ঠাকুর! জগত-সংসারে ঐটেকে নিয়েই ভুলে আছে কিনা!......

গাঙ্গুলির মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। হৃদয়ের মধ্যে অনন্ত চিন্তা লইয়া দাবার অপর প্রান্তে চাহিয়া দেখিতেই দেখিতে পাইলেন—উনুনের আগুন কখন নিভিয়া গিয়াছে! বলিলেন পদু দি, উনুনটা যে নিভে গেল?

—"যাক্‌গে"—বলিয়া পদু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, যতক্ষণ রাসু সেখানে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ আর সে বাহির হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এত সহজে এত অল্প কথায় কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার আনন্দ রাস-বিহারীর প্রাণটাকে যেমন আনন্দময় করিয়া তুলিল, তেম্নি আবার এই সংবাদে পদুর প্রাণের আঘাতের পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া তিনি একটু বেশ অস্থিরই হইয়া পড়িলেন, সামান্য নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক হইলেও পদুর প্রাণের আঘাত তো উড়াইয়া দিবার নয়, সে যে উমার মায়ের আসনে বসিয়া ভগবানের চক্ষেও অনেক—অনেক উচ্চে আসন পাতিয়া বসিয়াছে! তাহার এক একটী দীর্ঘশ্বাসে উমার কতখানি অমঙ্গল হইতে পারে—সেই চিন্তাটাই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল!...এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের দুর্ব্বলতা তাঁহার অন্তরের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—পিসিমা, পুরুতমশায়, সংসার, সমাজ সব এক হ'য়ে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াক্, তবুও তিনি উমাকে আনিয়া পদুর চক্ষের জলের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বজ্র অভিসম্পাত কিছুতেই কুড়াইতে পারিবেন না। স্নেহপুটে সে যখন উমাকে মানুষ করিয়াছে তখন সে নিজেই একদিন তাহার হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট দিয়া যাইবে—তাহার বিবাহ দিবার জন্য।...

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার স্নেহের ক্ষুধাও তাঁহার সমস্ত শরীরের মধ্যে

রিম্ রিম্ করিয়া উঠিল,—রূপোদা যখন দিতে স্বীকৃত হইয়াছে তখন পদ্মর লক্ষ কোটী অমত থাকিলেও সে তাহাকে এ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাহার মত করাইতে পারিবে, একান্তই যদি না পারে, তবে উমার সঙ্গে তাহাকেও তিনি তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া উমার মায়ের প্রাপ্য সম্মান দিতে এতটুকুও কৃপণতা করিবেন না।

কিন্তু যাইবে কি পদ্ম তাহাদের বাড়ীতে?...যদি না যায়?...না যাইবেই বা কেন? অনুনয়-বিনয়, সাধ্য-সাধনা কিছুই করিতে তিনি বাকী রাখিবেন না।...উমার চোখের জল সে কি দেখিতে পারিবে? না-না তাহা সে কখনই পারিবে না, উমাকে সে যে মানুষ করিয়াছে...সে যে উমার মা! কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া সে কি থাকিতে পারিবে?...না না...

চিন্তার পাহাড় বুকের মধ্যে পুরিয়া যখন তিনি গৃহে পৌছিলেন, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে পিসিমার কোনও কাজ না থাকায়, রাসবিহারীর আহার্য্য ঢাকা দিয়া বস্ত্রাঞ্চল মেঝের উপর বিছাইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন।

রাসবিহারীর ডাকাডাকিতে দ্বার খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে বাবা, আজ কথাটা বলতে পেরেছিস, না কালকের মত...

বাধা দিয়া রাসবিহারী বলিলেন—বলেছি পিসিমা।

উৎকণ্ঠিত ভাবে পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবে?...কবে আনবি?

—"যে দিন হোক" বলিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা পিসিমা! দিন কতক পরে নিয়ে এলে হয় না? দেবে যখন তারা বলেছে, তখন দু'দিন পরে আনলেই বা ক্ষতি কি?

অতি বড় দরদীর মত পিসিমা বলিলেন—না বাবা! শুভ কাজে আর দেরী করে কাজ নেই, আজ তারা মত করেছে, দুদিন পরে যদি আবার মত বদলে যায়? ও কাল পরশুই নিয়ে আয়।

সংযত কণ্ঠেই রাসু বলিলেন—মত বদলাবে কেন পিসিমা? তারাও যখন জানছে দিতেই হবে তাকে,—তা দুদিন পরে না হয় দুদিন আগে। তবে আমি বলছিলুম এতদিন যখন রইল—তখন আর দু তিনটে মাস...

বাধা দিয়া পিসিমা বলিলেন—ওরে বাপুরে! অতদিন আমি থাকতে পারব না রাসু, তাকে বুকে করবার জন্যে প্রাণটার ভেতর যে কি করছে! ...ও আর দেরী করা কাজ নেই বাবা! কালই তাকে নিয়ে আয়।

তেম্নি ভাবেই রাসবিহারী বলিলেন—তবে এক কাজ করি পিসিমা, তার সঙ্গে পদুকেও বাড়ীতে নিয়ে আসি, এত কষ্ট করে......

অবাক দৃষ্টিতে রাসুর মুখের দিকে চাহিয়া পিসিমা বলিলেন—বলিস কিরে রাসু? এটা কি মেলেচ্ছোর বাড়ী বাবা? যে একটা বাগ্‌দীর মেয়েকে বাড়ীতে রাখতে হবে?...না বাবা ওসব হবে না, মেয়েকে নিয়ে আয়, ..তার সঙ্গে বাগ্‌দির মেয়েটাকে...না রাসু! সে আমি কিছুতেই যায়গা দিতে পারব না, জাত ধর্ম্ম সব খোয়াতে হবে তা হলে।

—কিন্তু পিসিমা, যাকে আনবার জন্যে এতখানি ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, সেই ত জাত ধর্ম্ম সবই খুইয়ে আসছে, তাদের হাঁড়ির ভাত পর্য্যন্ত...

—আহা সে অজ্ঞান অবস্থায় রে বাবা, অজ্ঞানে সাপের বিষও খাওয়া যায়।

রাসবিহারী কোনও কথা বলিলেন না। তাঁহার অধর প্রান্তে একটু

হাসির রেখা খেলিয়া গেল, কিন্তু সেই হাসির মধ্য দিয়া কতখানি ঘৃণা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল, সেটা পিসিমা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—ওসব ঝন্‌ঝট করিস্‌নি রাসু, তোর মেয়েকে তুই নিয়ে আয়! অজাতকে আর বাড়ীতে যায়গা দিয়ে কাজ নেই।

—উমাই কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে পিসিমা?

—খুব পারবে রাসু—খুব পারবে, তাকে তুই নিয়ে আয়ত, তারপর দেখিয়ে দেবো—থাকতে পারে কি না। ছোট মেয়ে, দু'চার দিন তার জন্যে কাঁদ্‌বে তারপর সব ভুলে যাবে।

—আর যদি কোনও শক্ত অসুখই হয়ে পড়ে?

—বালাই ষাট্‌! অসুখ হবে কেন? ওসব অলক্ষুণে কথা মুখ দিয়ে বার করিসনি রাসু!

রাসবিহারী বলিলেন—কি জানি পিসিমা! সমস্ত পথটাই আমার কেবল এই ভয়টাই হয়েছে—অজ্ঞান বালিকা সে, যার কোলে শুয়ে এখনও সে রাজ্যের তৃপ্তি পায়, তার কোলছাড়া করলে যদি একটা শক্ত অসুখই হয়ে পড়ে, তবে তাকে বাঁচাতে পারব কি না! জ্ঞান হলে যদি তাকে নিয়ে আসতুম তা হলে হয়ত সে বুঝতে পারত এই বাড়ী খানার উপরেই তার দাবি সবার চেয়ে বেশী...নিজের মনকেও অনেকটা প্রবোধ দিতে পারত, কিন্তু এখন আনলে আর তা হবে না।...

—অতখানি পাতলা মন নিয়ে সংসার করা চলে না রাসু! ও সব ভাবনা তোর ভাববার দরকার নেই,—বিশেষ আমি যখন আছি,...নে এখন খেতে বোস।

পিসিমার জেদে গাঙ্গুলী আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু আহার্য্যের

কণামাত্রও তাঁহার মুখে ভাল লাগিল না, সমস্তটাই যেন কটুতিক্ত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

কোনও রূপে আহার শেষ করিয়া তিনি শয্যার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। এই সমস্যাটাই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, পদ্মকে পিসিমা এবাটীতে থাকিতে দিবেন না কেন? নীচজাতীয়া নারী বলিয়া? কিন্তু উপায়হীন অবস্থায় কন্যাকে যখন বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সেই নীচজাতীয়া নারীর শরণ লইতে হইয়াছিল, যাহার স্তনদুগ্ধে উমা আমার এত বড়টী হইয়া উঠিয়াছে, যাহার উচ্ছিষ্ট খাইয়াও সে স্বর্গীয় আনন্দে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে—সেই উমাকেই যখন বুকে তুলিয়া লইবার জন্য পিসিমার এতখানি আগ্রহ, তখন যে তাহাকে এত বড়টী করিয়া তুলিয়াছে—সে অস্পৃশ্যা কোন্‌খানটায়? বরং ভগবানের দেওয়া প্রাণীকে লালন পালনের ভার যখন সে গ্রহণ করিয়া বুকের এক একবিন্দু শোণিতপাতে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, তখন সে আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে, তাহার প্রতি এতখানি কঠোরতায় ভগবানের কতখানি অভিসম্পাত যে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে......

তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না, ভবিষ্যৎ আশঙ্কার গুরুভারে তিনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কেবল এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতে লাগিল—মায়ের কোল হইতে সন্তান ছিনাইয়া লইবার অপরাধ উমাকে কতদিন বাঁচাইয়া রাখিবে? নীচ জাতীয়া হইলেও তাহার চক্ষের জলে, মর্ম্ম যাতনায়, প্রাণের দুঃখে হয়ত বাড়ীর এক

পদ্ম ও উমা।

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ—উমার মাতৃসন্দর্শন

একখানা ইট খসিয়া পড়িবে !...ভগবান ! সমস্যার শেষ করে দাও, বলে দাও—আমার কর্ত্তব্য কি ?

চিন্তার তাড়নায় শয্যা তাঁহার ভাল লাগিল না।...জমিদার বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল, নিদ্রার কোলে গা ঢালিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না—কিছুতেই, যতই তিনি ভগবানের উপর সমস্তটা নির্ভর করিয়া সকল চিন্তার হাত হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই পিসিমার বজ্রের মত কথাটা তাঁহার প্রাণের মাঝে ঘা দিয়া তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল !...নীচ জাতীয়া বলিয়া উমাকে মানুষ করিলেও পদ্মর এ বাড়ীতে স্থান নাই !...তাঁহার হৃদয়ে বল দাও ভগবান !

চিন্তার আতিশয্যই যখন তাঁহাকে চিন্তার হাত হইতে মুক্তি দিল, তখন ভোরের আলো—সারা দেশটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র ভাবে কাটাইয়া এখন আর নিদ্রার উপাসনা তাঁহার ভাল লাগিল না, মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের দাবায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন।......

শয্যা ত্যাগ করিয়া পিসিমা যখন রাসুকে এইভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিতে দেখিলেন, তখন তিনিও বড় কম অবাক হইয়া গেলেন না। যে রাসুর সাতটা আটটার পূর্ব্বে ঘুম ভাঙ্গে না, সেই রাসবিহারীর এত ভোরে বিছান ছাড়িয়া ওঠা—তাঁহার প্রাণের মধ্যে এই কথাটাই জাগাইয়া দিল—কন্যাস্নেহের বিপুল আকর্ষণ বুঝিবা তাঁহাকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া দিয়াছে, তাই উৎকণ্ঠায় রাসুর এত সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে !

উচ্ছল আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—এত সকালে যে উঠেছিস রাসু? কোনও দিনই ত এমনটী হয় না!

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন—সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারলুম না পিসিমা! তাই আর...

বাধা দিয়া সহাস্যে পিসিমা বলিলেন—তাই হয় বাবা, প্রাণের মাঝে আনন্দের রাশ, ঘুমকে আর কাছে আসতে দেয় না। আমারও কি কাল রাত্তিরে ঘুম হয়েছে রাসু? যতবারই ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, মেয়েটার দুগ্‌গো-পিত্তিমের মত মুখখানা চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে ঘুম আর কাছে আসতে দেয়নি।...কখন যে তাকে কোলে তুলে নেবো,...একটু পরেই তুই যা বাবা, তাকে নিয়ে আয়! এই খাঁ-খাঁ বাড়ীখানা, সে এলেও কতকটা আনন্দে ভরে উঠবে!...

রাসবিহারী এতগুলো কথার একটা কথারও কিন্তু উত্তর দিলেন না, এইটাই তাঁহার অন্তরের মধ্যে কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিতেছিল—পদুর কোল শূন্য করিয়া উমাকে টানিয়া আনার মহাপাপ—তাঁহাকে কতখানিই না নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইবে!

তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল—রূপো আসিয়া। তাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রূপোদা—এত সকালে যে?

রুদ্ধকণ্ঠে রূপো বলিল—আর কিছুটা দিন তার কোলে মেয়েটাকে রেখে দাও দা'ঠাকুর!

রাসু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তি বলিয়া উঠিলেন—তা যে হবার নয় রূপো, সমাজে যেখানে বাধে. সেখানে কি আজ আমরা

তাকে ফেলে রাখতে পারি? এতদিন রাখাটাই ত এক অন্যায় হয়েছে,—

বাগ্দি হইলেও পিসিমার এই সূঁচ ফোটান কথায় রূপোর প্রাণের মধ্যে ঝড় বহিয়া গেল, তাহার পরের কথাগুলা শুনিবার মত প্রবৃত্তি হারাইয়া, কাতর স্বরেই বলিয়া উঠিল—এতদিন রেখেছিলেন পিসিঠান, আর দিন কতক রাখুন! কাল সারারাত পদুর কান্না আমাকে ঘুমোতে দেয়নি, মেয়েটার মুখের কাছে লম্প জ্বেলে সারারাত ঠায় কেঁদেছে, ঘুমন্ত মেয়েকে হাজারবার বুকে তুলে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে।—রক্তের ডেলাটাকে মানুষ করে অত বড়টা করে তুলেছে—শুঁনে অবধি প্রাণটা তার ফেটে যাচ্ছে।

কণ্ঠে বিষ মাখাইয়া জয়ন্তি বলিলেন—তা হলেও বাপু, যেখানে উপায় নেই—সেখানে রাখতে পারব না, আনতেই হবে। পদুর ত দুঃখ করবার কারণ কিছু নেই রূপো, গ্রামের লোক তোমরা, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে।

ব্যথাতুর কণ্ঠে রূপো উত্তর করিল—তা'ত যাবেই পিসিমা, সেদিন মেয়েটার জন্তে গাংশালিকের একটা ছানা ধরে খাঁচার ভেতর পুরে রেখেছিলুম, ওঃ মায়ের তার কি কান্না! ছেড়ে যখন কিছুতেই দিলুম না তখন বোধ কারি নিজে না খেয়েও তার সেই ছানাটাকে ঘণ্টায় দশবার করে ফড়িং খাইয়ে যাচ্ছিলো, তাতে আর আমরা কিছু বলিনি, কিন্তু সে খাইয়ে যাচ্ছিলো বলেই কি বুকের কান্নাটা তার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো পিসিঠান?

একটু বিরক্তভাবেই পিসিমা বলিলেন—কি যা তা বলতে আরম্ভ

করলি রূপো ?...তারপর কি ভাবিয়া একটু নিম্ন স্বরেই বলিলেন—যাকে তোরা এদ্দিন ধরে মানুষ করলি, তার ভবিষ্যতের জন্যেও ত—

বাধা দিয়া রূপো বলিল—সবই জানি পিসিঠান, আর দিন কতক থাক্ একটু ঠাণ্ডা হলে আমি নিজেই রেখে যাবো।

এতখানি কাতরতাতেও যখন পিসিমার প্রাণ গলিলনা, তখন রূপো পুরুষ হইলেও তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অশ্রুসিক্ত মুখে রাসবিহারীর দুইটী পা জড়াইয়া বলিল—একান্তই যদি আনবেন্ দা'ঠাকুর, পুরুত ঠাকুরকে দিয়ে একটা ভাল দিন দেখিয়ে নিয়ে আসুন, দুটো দিনও যদি সে তার কোলে থাকতে পায় !

উচ্ছ্বসিত আবেগে রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন—তাই হবে রূপোদা, আমি দিন দেখিয়েই নিয়ে আসব, তোমাদের চোখের জলে যে উমার আমার অকল্যাণ হবে তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না।

রূপোর মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না, রাসবিহারীর পায়ের তলার সমস্ত ধূলাই বোধ হয় সে মাথায় করিয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব পদুর অন্তরের মধ্যে এমনি একটা হাহাকার সৃষ্টি করিল যে, জগৎ-সংসারের কোনটাই তাহার ভাল লাগিল না। যে পদু দিনে বারো ঘণ্টার দশ ঘণ্টা পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিত, কাজ যেন সেই পদুর চক্ষে বিষময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর যে উমার মুখ দেখিলে পরিশ্রমের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া গিয়া তাহার হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর হইয়া যাইত, সেই উমাকে দেখিলেই বুকের মধ্যে কান্না গুমরাইয়া উঠে! হায় রে! যাহার মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে আর দু'এক দিন পরে তাহাকে ত আর কোলে লইতে পারিবে না! আর যে উমা 'মা' বলিয়া —তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না। এক মুহূর্ত্ত যাহাকে দেখিতে না পাইলে সে চক্ষে অন্ধকার দেখে, জন্মের মত তাহার সর্ত্তত্যাগ......ওগো ভগবান!

মনের এই দারুণ ঝড় তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেও সে কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিত না কিছুই। এই ভাবটাই সে সকলের নিকট প্রকাশ করিত—উমা তাহার এত দিন পরে তাহার নিজের ঘরে যাইবে, তাহার বাপের কোলে আশ্রয় পাইবে। যে কর্ত্তব্যের বোঝা তাহার

নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া লইয়াছিল, সেই কর্ত্তব্যটাকেই সে যে এমন করিয়া প্রতিপালন করিতে পারিয়াছে—এই আনন্দটাই তাহাকে সকলের অপেক্ষা বেশী আনন্দ দিতেছে—উমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার দুঃখ অপেক্ষা।

বাহিরে এই ব্যাপারটা লইয়া যতই সে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, অন্তর-দাহনে সে ততই পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল, রুদ্ধ ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া তাহার অন্তরকে তোলপাড় করিয়া দিতে লাগিল, যে উমা তাহাকে ছাড়া আর জানে না, তাহাদের কত আকিঞ্চনে রাসবিহারীর ব্যাকুল আহ্বানেও একদিনের জন্য তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই, পিতৃত্বের দাবি, কন্যা হইয়া যখন সে একদিনের জন্যও মানিতে চায় নাই—তখন সেখানে যাইয়া সে কি করিবে?......এক দিনের জন্যও সে তাহার মনে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিতে পারিবে কি?......যদি না পারে?—কি অবস্থা হইবে তাহার? হয় ত একটা সাংঘাতিক পীড়ায় এমনভাবে আক্রান্ত হইবে, যে, তাহাকে আর বাঁচাইতে পারা যাইবে না।

কথাটা মনে হইতেই তাহার চক্ষের কোণ দিয়া কয়েকবিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।......

ভাতের হাঁড়িটা উনানে চাপাইয়া, একটা পাথরের উপর কতকগুলা গুগ্‌লি রাখিয়া আর একটা ছোট পাথরের সাহায্যে পদ্ম সে গুলা এক মনেই ভাঙ্গিতেছিল। ঝোল রাঁধিয়া উমাকে খাওয়াইবে......উমার বড় প্রিয় জিনিষই যে এইটাই!

হঠাৎ তাহার একাগ্রতা দূর হইয়া গেল—উমার রুদ্ধ আহ্বানে! উমার ডাক শুনিয়াই সে হাতের কাজ ফেলিয়া তাহাকে স্নেহের চুম্বন দিতেই উমা জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ মা! তোরা নাকি আমায় তাড়িয়ে দিবি?

স্নেহসিক্ত কণ্ঠে পদ্ম বলিল—বালাই ষাট্! তোকে তাড়াব কি মা? কে বল্লে তোকে?

—কেন, গোজো বল্‌ছিলো।

—"তার কথা শুনিস কেন" বলিয়া পদ্ম তাহাকে আগ্রহভরে বুকের মাঝে চাপিয়া নিজের মুখখানি কন্থার মাথায় রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, সহস্রবার চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা বলিতে পারিল না।

হঠাৎ উমা বলিয়া উঠিল—তবে কেন সে বল্লে?

—মিছে কথা বলেছে মা! আজকাল তোর বাবা রোজই আসে কিনা, তাই হয় ত......

—কে আমার বাবা?

—সেই যে বামুন ঠাকুর!

হঠাৎ উমা মুখ ফিরাইয়া পদ্মর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, তাহার চক্ষু দুইটা জলে টল্ টল্ করিতেছে! দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—না মা, সে আমার বাপ নয়, তাকে তুই আমাদের এখানে আসতে দিস্‌নি।

পদ্ম তাহার মুখ চাপিয়া বলিল—ছিঃ অমন কথা বল্‌তে নেই মা, বামুন—দেবতা।

—হোক্ দেবতা।

—তার ওপর তোর বাপ।

—না—কিছুতেই নয়।

—ছি, ও কথা বল্‌তে নেই মা—পাপ হয়।

—আচ্ছা ও কথা বলব না, কিন্তু সত্যি করে বল্ দেখি, আমাকে তোরা তাড়িয়ে—

—আবার ঐ কথা উমা ?

পদ্ম আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়া উমার মুখখানিকে ঘন ঘন মুছাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার একটা কথাও বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটাইয়া, কন্যার হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য বলিল—চৌকির নীচে ছোলার চাকি ঢাকা আছে, নিয়ে খেগে যা মা !

উমা কিন্তু অন্য দিনের মত যাইবার জন্য এতটুকুও ব্যাকুলতা দেখাইল না, সে যেমন ভাবে তাহার কোলে বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল।

কণ্ঠে স্নেহ মাখাইয়া পদ্ম বলিল—যা-মা যা, খেয়ে খানিকটা খেলে আয়, আমি ততক্ষণ রসুইটা সেরে নিই,...আজ তোর জন্যে গুগ্‌লি তুলে এনেছি উমা, কি রাঁধব বল দেখি ?—ঝোল না ঝাল ?

গুগ্‌লির নাম শুনিলে যে উমার চোখে-মুখে রাজ্যের আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইত, সেই উমার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, রূপো ও পদ্মর কাছ ছাড়া হইবার কথা শুনিয়া অবধি মন তাহার অবসাদে পূর্ণ হতভম্বের মত করিয়া দিল।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—তোর কি হ'ল উমা ?

অভিমানোদ্দীপ্ত কণ্ঠে উমা বলিয়া উঠিল—কিচ্ছু হয়নি।

—তবে যা—খেয়ে নে।

—না—অসুখ করবে।

উমার কথায় এত দুঃখের মাঝেও পদ্মু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে হাসিয়াই বলিল—খুব জ্ঞানগম্যি হয়েছে নে ওঠ্ ! বলিয়া তাহাকে কোলে লইয়া তাহার জন্য আনীত ছোলার চাকৃতি হাতে দিতেই, উমা বলিয়া উঠিল—খাব না আমি—যত বলছি !

হাসিয়া পদ্মু বলিল—খাবি না কেন শুনি ?

—না খাব না, তুই তখন কাঁদছিলি কেন বল্ ?

—তুই আর জ্বালাস্‌নি উমা, ঝোড়ো তোকে খুঁজতে এসেছিল, যা খানিকটা খেলে আয়, হাতের কাজটা আমি ততক্ষণ সেরে ফেলি।

উমা কিন্তু কিছুতেই যাইতে চাহিল না, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দের মত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে এমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পদ্মু তিরস্কারের সুরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বলিবার কথায় বাধা দিল রূপো, গৃহপ্রাঙ্গন হইতে সে বলিল—পারলুমনা রে পদ্মরাণি, গরীবের কান্না...

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পদ্মু চক্ষের ইঙ্গিত করিতেই রূপো তাহার অবশিষ্ট কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নির্জ্জীবের মত দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ তাহার কথাটাকে অসমাপ্ত রাখিতে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে উমা জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলি বাবা—তাড়িয়েই দিবি আমাকে ?...কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আঁখিলোরে তার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি পদ্মু তাহাকে কোলে লইয়া বলিল—চল তোকে ঝোড়োর কাছে দিয়ে আসি......বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই উমা বলিল—ছাড়্ আমি যাচ্ছি।

উমা বাহির হইয়া গেলে রূপো বলিল,—প্রাণ কিছুতেই গলাতে পারলুম না পদ্ম!—আজ রোব্‌বার, বুধবারে তারা নিয়ে যাবে।

মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া পদ্ম বলিয়া উঠিল—এত শীগ্‌গির যে তারা আমাদের রেহাই দেবে, এ কথাটা ভাবতেই পারিনি রে মিন্‌সে, তার জন্যে আবার তুই দুমড়ে পড়েছিস্ অত?

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিষাদহাস্যে রূপো বলিল—তুইও ত কম দোমড়াসনি পদ্মরাণি!

—"বয়ে গেছে না"—বলিয়া পদ্ম বলিল—নিজের দু'টোকে যমের মুখে তুলে দিয়ে বড্ড দোমড়ালুম, তা পরের......

রূপো বলিল—তোর কথাগুলোই যে ধরিয়ে দিচ্ছে পদ্ম কতখানি তুই কাতর হ'য়ে পড়েছিস! পুরুষমানুষ আমি, আমার বুকখানা কান্নায় ভরে উঠেচে, আর তুই আপন-ভোলা হয়ে ওটাকে এত বড়টা করে তুল্লি,...

পরের কথাগুলা না শুনিয়াই পদ্ম বলিয়া উঠিল—মনে করিসনি মিন্‌সে, আমার এতটুকু কষ্ট হয়েছে। তোর প্রাণ কান্নায় ভরে উঠছে, আমার কিন্তু ভারি আনন্দ হচ্চে—উমা তার বাপের কাছে এতদিন পরে যায়গা পাবে বলে।

জোর করিয়া এতগুলো কথা মুখ দিয়া বাহির করিলেও কোথা হইতে একটা হাহাকার তাহার বুকের মধ্যে লুটোপুটী খাইতে লাগিল, কিন্তু অদম্য সহ্যগুণে সেটাকেও সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কবে নিয়ে যাবে বল্‌ছিলি—বুধবার?

রূপোর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, কেবল মাথাটা হেলাইয়া জানাইয়া দিল—হ্যাঁ।

পদ্ম আর কোনও কথা না বলিয়া হঠাৎ নিভন্ত উনুনটার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।......

রূপোর দ্বারপ্রান্তে চাহিতেই দেখিতে পাইল—স্তব্ধ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আছে উমা!—ডাকিল—উমা—উমা—আয় রে, হেথা আয়!

—"আমি সব শুনেছি বাবা" বলিয়া উমা ঝড়ের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল নাকি?

—হ্যাঁ,...কিন্তু তুই কাঁদছিস পদ্মরাণি?

—নাঃ, উনুনের ধোঁয়ায় জল বেরুচ্ছে...কিন্তু শুনে ফেল্লে ও?

—"দু'দিন পরে শুনত, না হয় দু'দিন আগেই শুনলে"—বলিয়া রূপো যেমন ভাবে বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উমাকে খেলিতে পাঠাইবার জন্য পদ্মর এতখানি আগ্রহ, উমাকে খেলিতে যাইবার জন্য ততখানি ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারিল না। অন্য দিন যতখানি তাহাকে করিয়া তুলিত আজ গোজোর মুখে যে কথাটা শুনিয়া সে অস্থিরভাবেই পদ্মর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল—তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য, সেটায় কোনও নিরূপণ না হইয়া বরং পদ্মর নিকটও ভাসা ভাসা উত্তরে প্রাণের মধ্যে পাষাণেরই মত কিসের একটা গুরুভার চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর রূপোর কথাটা প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চাপিয়া যাওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে খেলিতে পাঠাইবার জন্য পদ্মর এতখানি আকিঞ্চন, উমাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে না দিলেও ভিতরে যে মস্ত একটা কিছু ঘটিয়া যাইতেছে—এইটাই যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার পা দুইখানা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। দ্বারদেশের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিল—স্পষ্ট কিছু শুনিবারই আশা বুকে লইয়া।......

তারপর এই দুই স্বামী-স্ত্রীর কথা যখন গোজোর কথারই প্রতিধ্বনি বলিয়া জানিতে পারিল, তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাহার নিকট একটা জড় পদার্থেরই মত তাহার মনে হইতে লাগিল। নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বাড়ীখানার মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।...

ঠিক সেই সময়ে খেলিবার জন্য ঝোড়োও তাহাকে খুঁজিতে আসিতেছিল। তাহাকে এমনিভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—উমা, চল খেলিগে, গোজো, পদা, দুলো সব্বাই এসেছে।—কাণামাছি খেলা হবে, মাঠের পাড়াতে আজ খেলা হবে, সবাই এগিয়ে গেছে—চল্।

তাহার এতগুলো কথার উত্তর উমা এক কথাতেই দিল, বলিল—না যাব না।

আশ্চর্য্য দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিতেই ঝোড়ো দেখিতে পাইল, উমা কাঁদিতেছে! তাহার হাতখানি ধরিয়া সমবেদনার মুখে ঝোড়ো জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছিস কেন উমা?—মা মেরেছে?

জলভরা চোখেই উমা বলিল—মারবে কেন? কোনও দিন মা মেরেছে?

—"তবে তুই কাঁদছিস?—চল খেলিগে, ছিঃ কাঁদতে আছে?" বলিয়া ঝোড়ো তাহার চক্ষু দুইটী উমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিতেই সে তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা আর মা তাড়িয়ে দিয়েছে ঝোড়ো দা!

তাহার ক্রন্দনের কারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, ঝোড়ো খেলিবার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল; স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিল—যাঃ মিছে কথা!

এই সামান্য কথাটার উত্তর উমার মুখ দিয়া বাহির হইল না, বলিবার উপক্রমেই কে যেন তাহার গলাটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল, পূর্ব্বেরই মত নয়ন-নীরে তাহার গণ্ডঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল!

তাহার এই ভাবটাকে বদলাইয়া দিবার জন্য ঝোড়ো বলিল—মিছে কথা শুনে এত কাঁদছিস কেন উমা, চল্ বরং খেলা করিগে।

উমার প্রাণের মধ্যে ঝড়ের যে ভীষণ দাপট চলিতেছিল, তাহাতে সে খেলিবার জন্য এতটুকু আগ্রহ দেখাইতে না পারিলেও, ঝোড়ো তাহার হাত ধরিয়া একরূপ জোর করিয়াই খেলিবার উদ্দেশ্যে তাহার পা দুইখানা চালাইয়া দিল। যাইতে যাইতে বলিল—তোকে আমি বোনের মত ভালবাসি উমা, আমার কথা শোন্, কাঁদিসনি—ওসব মিছে কথা—আমি বল্‌ছি।

—না ঝোড়ো দা, বাবা যে মাকে বলছিলো, আমি নিজের কাণে শুনেছি।

—পাগ্‌লি আর কি—তারা কি বলছিল আর তুই কি শুনেছিস। যেটা কখনো হতে পারে না, সেটা তুই বল্লেই আমি বিশ্বাস করবো? ছেলে মানুষ তুই, না বুঝেই এতখানি হেদিয়ে পড়লি?

একটু তিক্ত কণ্ঠেই উমা বলিল—এখনও যদি ছেলে মানুষ থাকব, বোঝবার শক্তি যদি নাইই হবে তবে বয়েস আমার আট বছর হলো কেন?

হাসিয়া ঝোড়ো বলিল—না রে আমারই ভুল হয়েছে, আট বছর বয়স কি কম রে—একে-বা-রে বুড়ী!

ঝোড়োর কথায় একটু অসন্তুষ্ট ভাবেই উমা বলিল—তোমাদের হয়ত আশী বছরে জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু আমাদের আট বছরই যথেষ্ট।

—"তোর এই কথাটাই—সেটা প্রমাণ করে দিলে উমা!" বলিয়া ঝোড়ো বলিল—দাঁড়ালি কেন? চল্ শীগ্‌গীর, তারা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—আমার আজ কিচ্ছু ভাল লাগছে না ঝোড়োদা!—তুমি যাও!

উমার খেলিবার এতখানি অনিচ্ছায়, ঝোড়ো আর কোনও কথা না বলিয়া বলিল—খেলাই যদি তোর ভাল না লাগে উমা, তবে চল ঘোষালদের বাগানে জাম কুড়ুইগে, ওঃ কি জামটাই পেকে রয়েছে!

তাহার উপর ঝোড়োর কতখানি স্নেহ, আশৈশব তাহা দেখিয়া, উমা সত্যসত্যই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহাকে ছাড়া ঝোড়োর একটা দিনও খেলা করিতে ভাল লাগে না, গোচারণে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া না যাইলে তাহার কাজে সে এতটুকুও আনন্দ পাইত না, অতি কষ্টে মাঠের মাঝে দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদের বাড়ীতে ছুটিত, তখন আর তাহার এই অনুরোধটাকে সে একেবারেই এড়াইতে পারিল না, অন্তরের মধ্যে যাতনার রাশ লইয়া বলিল—চল।

কতকটা পথ চলিতে চলিতে, সম্মুখে বাঘ বা সিংহ দেখিলে মানুষ যেমন ভয়াতুর হইয়া উঠে, উমাও ঠিক তেমনি চম্‌কাইয়া উঠিল! কতকটা দূরে রামুগাঙ্গুলীকে আসিতে দেখিয়া, মুখখানাকে কান্নায় ভরাইয়া সে ঝোড়োর হাত দুইটাকে চাপিয়া বলিল—এধার দিয়ে না ঝোড়োদা, ঐ পুকুরের...

ব্যস্তভাবে ঝোড়ো বলিল—কি বলছিস উমা?—ভয় কিসের?

—এখনই ধরে নিয়ে যাবে ঝোড়ো দা!

—কে?

—ঐ যে আসছে—ঐ বামুনটা।

হাসিয়া ঝোড়ো বলিল—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে উমা, আমার সঙ্গে—

আর বেশী কথা শুনিয়া তাহার উত্তর দিতে যাইলে হয়ত ততক্ষণে রাম্নু গাঙ্গুলী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে—এই আশঙ্কায়, উমা আর তাহাকে কোনও কথা বলিতে না দিয়া শঙ্কাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আয় না ঝোড়োদা, তা নইলে আমি একলাই পালাব।

রাম্নু গাঙ্গুলী আরও কতকটা অগ্রসর হইয়া আসিলে, উমা আর সেখানে তিলার্দ্ধ না দাঁড়াইয়া একরূপ উর্দ্ধশ্বাসেই পলাইয়া গেল।......

সস্নেহে রাম্নু ডাকিলেন—উমা!—মা রে! আয় একবার কোলে আয়!

এই স্নেহ-আহ্বানের উত্তর একটু ভিন্ন রূপেই গাঙ্গুলির কাণে আসিয়া পৌঁছিল।...কতকটা দূর হইতে উমা চীৎকার করিয়া বলিল—যাবো না—তুই রাক্কোস।......

কন্যার কথায় গাঙ্গুলী জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বুকের মাঝে কান্না যেন গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। আপন মনেই বলিলেন—ঠিকই বলেছিস মা!—রাক্ষস কেন, তারও অধম,......কিন্তু কি করবো কোনও উপায় নেই।

ঝোড়ো ডাকিল—হেথা আয় উমা! ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কেউ নিয়ে যাবে না তোকে।

পুকুর পাড়ের ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করিবার জন্য উমা ছুটিয়া চলিল, ঝোড়োর কথায় একটাও উত্তর দিল না সে।...

বেলাটা অনেকখানি হইয়া গেলেও উমা যখন আহারের জন্য ছুটিয়া আসিল না, তখন পদ্ম আর তাহার আসিবার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহার অন্বেষণের জন্য বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই যখন সে ঝোড়োর বাটীতে যাইয়া দেখিল দুই জনের একজনও বাড়ীতে নাই তখন গ্রামের প্রত্যেক আমবাগানের সমস্ত যায়গাটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল কিন্তু কোনও স্থানেই তাহাদের সন্ধান না পাইয়া অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া ঠিক উন্মত্ত কুকুরের মত গ্রামের প্রত্যেক স্থান চুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এত করিয়া যখন তাহার কোনও সন্ধান পাইল না, তখন সে বুকের মাঝে হাহাকারের রাশ লইয়া ছুটিয়া গেল—রামু গাঙ্গুলীর বাড়ীতে—যদি তিনি তাহাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গিয়া থাকেন!

কিন্তু সেখানে তাহাকে দেখিতে না পাইলেও যখন জানিতে পারিল, গাঙ্গুলিকে দেখিয়াই ভয়ের প্রতিমূর্ত্তির মত উমা দুধ-পুকুরের তীর দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, তখন তাহার সারা দেহ আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল!...... জঙ্গলের মধ্যে আবাগি কোথায় বসিয়া আছে...সাপখোপ্......

পরের কথাটা আর সে ভাবিতে পারিল না, মাথাটা তাহার টন্‌টন্ করিয়া উঠিল,...ছুটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ দিয়া কম্পিত স্বরে বাহির হইতে লাগিল—উমা!—উমা!! ও উমা!!!

কিন্তু কোনও স্থান হইতেই পদ্মর এই কাতর ডাকের উত্তর উমার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল না।

কথামত কাঁদিতে কাঁদিতে সে যখন দুধ-পুকুরের তীর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বোস-পুকুরে সুউচ্চ পাড়ে যাইয়া পৌছিল, তখন দেখিতে

পাইল বৃহৎ বটগাছের তলে উমার নিদ্রিত দেহখানা পড়িয়া রহিয়াছে।

সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইতেই, উমার নিদ্রা টুটিয়া গেল, কাতর ভাবেই বলিয়া উঠিল—আমাকে সেখানে পাঠাসনি মা! তোকে ছেড়ে আমি কিচ্ছুতেই থাকতে পারব না।

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পদ্ম বলিল—কে বল্লে সেখানে পাঠাব রে?

—আমি সব বুঝতে পেরেছি মা!—

ছলছল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া পদ্ম বলিল—একদিন যে সেখানে তোকে যেতেই হবে মা—তা দুদিন আগে আর দুদিন পরে,... কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর বুক ফাটিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

উমা একটা কথাও বলিতে পারিল না।

বাড়ীতে আসিয়া স্বামীর কোলে উমাকে দিয়া বলিল—ধর ত একটু, আমি ভাতটা বেড়ে ফেলি।

রূপোর কোলে বসিয়া উমা বলিল—সেই গল্পটা বলনা বাবা!

রূপো জিজ্ঞাসা করিল—কোন্‌টা মা?

সেই যে রাক্ষসীর দেশে একরাজ পুত্তুর যেয়ে কোয়ার ভেতর থেকে বাক্স বার করে ভোমরা-ভুমরিকে মেরে সাত শ রাক্ষসীর পেরাণ নষ্ট করেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উমার ক্রন্দন, পদ্মর প্রাণের আকুলি-বিকুলি, আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য রূপোর কাতর অনুরোধ, এ সবের কোনটাই আর উমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া আট বৎসরের টী যখন সে হইয়াছে, তখন তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া গাঙ্গুলী অনেকখানি ইতস্ততঃ করিলেও, পারিপার্শ্বিক উত্তেজনা কন্যাকে নিজের গৃহে আনিতে বাধ্য করিল।

পদ্মর কাছ ছাড়িয়া আসিবার ব্যাকুলতা, যখন গায়ের রক্ত জল করিয়া উমার চক্ষু দিয়া অজস্র ধারে বাহির করিয়া দিল, তখন এই বাগ্‌দী দম্পতির হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো কে যেন তাহার অদৃশ্য হস্ত দিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিল। রূপো স্ত্রীকে বলিল—যা পদ্ম! তুই নিজে কোলে কোরে নিয়ে যা—একটু ঠাণ্ডা হ'লে চলে আসিস।

পদ্ম হাত দুইটা বাড়াইয়া দিতেই উমা তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া দিল।

গাঙ্গুলী ও পদ্ম যখন উমাকে লইয়া বাড়ী আসিল, তখন পিসিমা অন্তরের মধ্যে আনন্দের উৎস লইয়া উমাকে কোলে লইতে উদ্যত হইলে সে আরও জোরে পদ্মকে জড়াইয়া ধরিল।

রুদ্ধকণ্ঠে পদ্ম বলিল—যা মা, উনি যে তোর ঠাকুমা হয়।

একথার পরও যখন সে যাইবার জন্য এতটুকুও আগ্রহ দেখাইল না, তখন পদ্ম স্নেহের ধমক্ দিয়া একরূপ জোর করিয়াই কোল হইতে তাহাকে নামাইয়া দিল। পিসিমা আনন্দের আবেগে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। উমা কিন্তু কাঠ হইয়া রহিল, মুখ দিয়া একটা কথাও তাহার বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ সেইস্থানে থাকিয়া পদ্ম চলিয়া গেল।...গাঙ্গুলী তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলে, অশ্রু ভারাক্রান্ত চক্ষে সে বলিল—না দা'ঠাকুর! পুরুষটো ঘরে রয়েছে, তাকে ত যা হোক দুটী দিতে হবে।...

...এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীখানা উমার চক্ষে সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা জেলখানার মতই মনে হইতে লাগিল। যতই তাহার চক্ষের সম্মুখে রূপোর সেই পাতার কুঁড়ে ঘর খানা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, ততই যেন তাহার বুকের মাঝে কান্না গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সেই ঘরে তাহার যতখানি ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও সে এখানে পাইবে না। সেই দুইটী নর-নারী যাহাদের বুকের রক্তে সে এত বড়টা হইয়া উঠিয়াছে—আজ হয়ত তাহারা অন্নের একটা দানাও মুখে দিবে না, ধূলায় পড়িয়া হয়ত তাহারা লুটাইয়া কাঁদিতেছে!......

চিন্তার প্রবাহ তাহাকে কোন্ দেশে টানিয়া লইয়া গিয়া কেমন এক রকম করিয়া দিল। তাহার মনের মধ্যে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কী মহাপাপ তাহারা এমন করিয়াছে, যাহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের হৃদয়টাকে উপড়াইয়া ফেলিয়া করিতে হইতেছে? ছুটিয়া একবার তাহাদের কোলে যাইবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল,

কিন্তু পারিল না সে, সে তখন জয়ন্তির কোলে ঠিক জেলখানায় গারদ-ঘরের মধ্যেই বাস করিতেছিল।...উঠিবার একটু চেষ্টা করিতেই ঠাকুমা তাঁহার দুই বাহু দিয়া তাহাকে চাপিয়া স্নেহ-শীতল কণ্ঠে বলিলেন—এরই মধ্যে উঠিস নি দিদি, কতদিন তোকে এই কোলে নেবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছি—বোস্‌ দিদি আর একটু বোস।

তাহার নিবিড় স্নেহ মাথান কথার প্রত্যেক অক্ষরটী দিয়া উমার মনে হইতে লাগিল, যেন আগুনের একটা ফুল্কি বাহির হইয়া আসিতেছে! সে নিস্তব্ধ ভাবেই ঠাকুরমার কোলে বসিয়া রহিল।

উদাস অন্যমনস্ক ভাব কতখানি কন্যার বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া রাসবিহারী ভোবনার দোকান হইতে সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়া তাহার হাতে দিলেও সে সেইরূপ অবস্থাতেই বসিয়া রহিল; এতটুকু স্পর্শ করিবার মত প্রবৃত্তি তাহার রহিল না।

স্নেহ মধুর কণ্ঠে রাসবিহারী বলিলেন—খা না রে মা—খেয়ে ফেল্‌!

ব্যথা ভরা চক্ষু দুটী পিতার মুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া উমা বলিল—খাবো'খন।

জয়ন্তি, আদরের সুরে বলিলেন—মনটা বড্ড খারাপ হয়েছে—না—দিদি?

কম্পিতকণ্ঠে উমা বলিল—না।

—"খা তবে" বলিয়া আনীত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে একটা তাহার মুখে গুঁজিয়া ধরিলে, কণামাত্র দাঁতে কাটিয়া উমা বলিল—খাব না এখন, বড্ড তেঁতো।

তাহার কথায় পিসিমা হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু গাঙ্গুলী সে হাসিতে

এতটুকুও যোগ দিতে পারিলেন না, তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিল, অনেক বারই উমা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছে, হাসি মুখে 'বামুন বাবা' বলিয়া ডাকিয়াছেও অনেকদিন, তখন ত আনন্দ ছাড়া নিরানন্দের ভাব তাহার মুখে এতটুকুও ফুটিয়া উঠিত না, কিন্তু আজ এতখানি যত্নের মধ্যেও তাহার এই যে দারুণ মর্ম্ম-বেদনার মূর্ত্ত বিকাশ, তাহার এই সামান্য কথাটার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এইটাই যদি বরাবর থাকে, তবে সেটা তাহার দেহ-মনের দিক দিয়া কতখানি উপকারী হইবে?...সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এতটা তাড়াতাড়ি করিয়া পদুর স্নেহ কোল হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনার ফল কী হইয়া দাঁড়াইতে পারে?...চিন্তার আতিশয্যে কান্নাটাই যখন বুকের মাঝে ঠেলা মারিয়া উঠিতে লাগিল তখন আর তিনি সেস্থলে না দাঁড়াইয়া নিজের ঘর খানার মধ্যে চলিয়া গেলেন।......

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে অনেকটা স্থির করিয়া লইয়া ডাকিলেন—উমা!

উমার এতটুকুও থাকিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, জয়ন্তি তাহাকে গাঙ্গুলীর কোলে দিয়া রন্ধন কার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিতেই, গাঙ্গুলী বলিলেন—আয় উমা! আজ ত তুই একবারও 'বামুন বাবা' বলে ডাক্‌লি না?

স্নেহসিক্ত কণ্ঠের এই কাতর অনুযোগ উমার প্রাণকে খুব বেশী দ্রব করিতে না পারিলেও সমবেদনার রসে ভরাইয়া দিল। কোনও কথা না বলিয়া তাহার সজল নয়ন দুটী রাসবিহারির মুখের উপর নিক্ষেপ করিতেই, তিনি দেহ-বেষ্টনিতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া চুম্বনের পর

চুম্বন দিয়া পিতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটা যেন উজাড় করিয়াই ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।......

উমার হৃদয়ের গুরুভারের সহিত পিতার প্রাণ ঢালা স্নেহাশীস মিশিয়া, তাহার চক্ষুকেও আর শুষ্ক থাকিতে দিল না।

হাসিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—তাদের জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়েছে—না উমা!—যাবি সেখানে?

চঞ্চল ভাবেই উমা বলিয়া উঠিল—যাবো।

—খাওয়ার পর আমিই তোমায় নিয়ে যাব মা, মন খারাপ করবে কেন? যখনই ইচ্ছে হবে সেখানে যাবে তুমি,—এই এতবড় বাড়ীখানা সবই তোমার!...পদ্মকেও এখানে টেনে নিয়ে আসবো...কেবল খাবার সময় আর রাত্তিরটা এখানে থেকো।......

তারপর আর কোনও কথা না বলিয়া উপাধানের নিম্নদেশ হইতে চাবি লইয়া স্ত্রীর বহু দিবসের পরিত্যক্ত তাহার সাধের সাজান আলমারিটার ডালা খুলিয়া বলিলেন—দেখ্‌ছিস মা, এইগুলো সব তোর মা মরবার সময় তোর জন্যে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল,...নে মা—যেটা ইচ্ছা তোর...খেলা করবি।

আহারের সময় পিতার কাছে খাইতে বসিলেও, আহার্য্যের কিছুমাত্র তাহার ভাল লাগিল না, কেবলই মনে হইতে লাগিল এই আহারের সময় পদ্মর সহাস্য মুখের মৃদু তাড়না! তাহার মুখে পদ্মর সাগ্রহে আহার তুলিয়া দিবার কথা!

জয়ন্তি বলিলেন—খা না উমা! খাইয়ে দেবো?

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই উমা বলিয়া উঠিল—না।

—তবে খা না দিদি! খাচ্ছিস না কেন?

—ভাল লাগছে না।

হাসিয়া জয়ন্তি বলিলেন—বাগ্‌দী-বাড়ীর গুগ্‌লির ঝোল.... ..

কথাটাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়া একটু দীপ্তকণ্ঠেই উমা বলিয়া উঠিল—এর চেয়ে ঢের ভাল।...আমায় তোমরা রেখে আসবে চল।

তাহার মুখে ভাত তুলিয়া দিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—খাওয়ার পর দুজনেই যাবো মা—এই ক'টা খেয়ে নে।......

আহারাদির পর রৌদ্রের অজুহাতে পিসিমা তাহাদিগকে আর বাহির হইতে দিলেন না।

গাঙ্গুলী কন্যাকে লইয়া তাঁহার ঘরখানার মধ্যে, আলমারি হইতে চাবি বাহির করিয়া, উমার মনটাকে একটু প্রফুল্ল রাখিবার জন্য তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিলেন।

দুই তিন ঘণ্টা কোনও রূপে নিজেকে সামলাইয়া রাখিলেও, উমা কিন্তু আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। সেই পাতার ঘরখানার মধ্যে যাইবার জন্যই ছটফট করিতে লাগিল।

পদুর কোল ছাড়া হইবার যে মর্ম্মান্তিক জ্বালা কতখানি ভীষণ মূর্ত্তিতে কন্যার প্রাণের মধ্যে দেখা দিয়াছে এবং তাহাকে আরও কিছুক্ষণ আটকাইয়া রাখিলে সেই জ্বালার পরিমাণ কতখানি বাড়িয়া উঠিবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রাসবিহারী বলিলেন—চল্ মা! পদুর কাছে তোকে নিয়ে যাই।

কথাটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, উমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী তাহাকে কোলে লইবার উপক্রম করিতেই সে বলিয়া উঠিল —আমায় কোলে করতে হবে না, আমি চলে যেতে পারব।

তাহার হাতখানি ধরিয়া গাঙ্গুলী বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, সম্মুখে দেখিতে পাইলেন—রূপো তাহার কোঁচার খুঁটে কতকগুলা কি বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে।

দৌড়াইয়া উমা তাহার কোলে উঠিতেই, কোন্ ফাঁকে যে তাহার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল বাহির হইয়া আসিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, উমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সেইরূপ স্নেহের ডাক দিয়া বলিল—মা—মা রে!

গাঙ্গুলী বলিলেন—তোমারই বাড়ী যাচ্ছিলুম রূপো দা! সেই থেকে মন্‌মরা হয়ে রয়েছে,...পদুর কাছে—

বাধা দিয়া রূপো বলিল—সে ত নেই দা'ঠাকুর।

একটু ব্যস্তভাবেই রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন—গেল কোথা?

হাসিয়া রূপো বলিল—আজকাল তার ধান ভানার কাজটা বড্ড বেড়ে গেছে দা'ঠাকুর, মেয়েটাকে রেখে যেয়ে অবধি সে ধানই ভেনে বেড়াচ্ছে।

—তা হলে তার কাছে যে নিয়ে যেতে হবেই রূপোদা!

—সন্ধ্যাকালে নিয়ে যেও দা'ঠাকুর! ততক্ষণকে সে বাড়ী ফিরে আসবে।

হঠাৎ আঁচলে বাঁধা জিনিষটার উপর নজর পড়িতেই উমা হাসিয়া বলিল—এগুলো কি বাবা?

জয়ন্তি দাবার উপর বসিয়াছিলেন, রূপোকে পিতৃনামে আখ্যা

দেওয়াটা তিনি বেশ পছন্দ করিলেন না, বলিলেন—আজ হতে 'বাগ্দী-বাবা' বলেই ওকে ডাকিস্ দিদি!—আসল বাবা তোর রাসু!

একবার তাহার দিকে চাহিয়া রূপো উমাকে বলিল—না রে মা! আজ থেকে তুই আমায় 'রূপো' বলেই ডাকিস।

উমা কিন্তু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এগুলো কি বল না বাবা? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার ক্রোড় হইতে নামিয়া জিনিষটার বাঁধন খুলিয়া ফেলিতেই, দেখিতে পাইল কতকগুলো করঞ্জা তাহাদের গায়ে লাল রং মাখিয়া হাসিয়া লুটোপুট্টী খাইতেছে!......আনন্দে বিভোর হইয়াই উমা সেই গুলাকে দুই হাতের মুঠোর মধ্যে পুরিয়া লইতেই, জয়ন্তি হাঁ হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ কি কচ্ছিস রূপো? জ্বরের ঘর—এই জিনিষগুলো! খেলে এখনই অসুখ করবে, ফেলে দে বলছি।

দুঃখের হাসি হাসিয়া রূপো বলিল—এগুলো ও বড্ড ভালবাসে পিসি-ঠান, বন বাদার ঘুরে এইগুলো কুড়িয়ে আনত,...টক্ খেতে খুব ভালবাসে কি না।

ধর্ম্মভীরু গাঙ্গুলী এই কথাটাকে আর বেশী বাড়াইয়া রূপোর প্রাণে দুঃখের বোঝা না চাপাইয়া বলিলেন—একে এখন তুমি নিয়ে যাও রূপোদা, সন্ধ্যার সময় আমি নিয়ে আসবো।

রূপো কিন্তু উমাকে লইয়া গেল না, সন্ধ্যার পর তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর চলিয়া গেল।...

সন্ধ্যার পরই লইয়া যাইবার সান্ত্বনা দিয়া গাঙ্গুলি কন্যাকে ভুলাইয়া রাখিলেন।

সন্ধ্যার সময়ও কিন্তু তাহাদের যাওয়া হইল না, আকাশ হইতে জল ঝড়ের মাতন—তাহাদের যাইবার পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল।

রাত্রে পিতার নিকট শয়ন করিলেও উমা কিছুতেই নিদ্রা যাইতে পারিল না, প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল—এই দুগ্ধফেননিভ কাঁটার শয্যার অপেক্ষা ছেঁড়া চ্যাটাই তাহাদের কত কোমল কত আরামপ্রদ ছিল!

রাত্রি বারটার পরও যখন যখন সে নিদ্রা যাইতে পারিল না, তখন গাঙ্গুলী স্নেহ মধুর কণ্ঠে বলিলেন—ঘুমোনা মা!

—ঘুম যে পাচ্ছে না বামুন বাবা!

আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল, কন্যার উপর এইরূপ ব্যবহার অত্যাচারেরই নামান্তর মনে করিয়া, পিতা বলিলেন—চল্ মা! তাদের কাছে তোকে রেখে আসি!......

ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে উমা বলিল—যাবে বামুন বাবা?

—"যাব বৈকি মা! তোর জন্যে আমি সব করতে পারি!"—বলিয়া গাঙ্গুলী সেই নিঝুম রাত্রে কন্যাকে কোলে লইয়া পদুর বাড়ীর দ্বারে আসিয়া ডাকিতেই—উৎকণ্ঠিতা পদু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল!

গাঙ্গুলী বলিলেন—আজ তোমার কাছেই থাক্ দিদি!

রুদ্ধকণ্ঠে পদু বলিল—থাক, কাল সকালেই আমি দিয়ে আসবো!......

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উমাকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া পদ্ম হৃদয়ের মধ্যে সারাদিন যতখানি শূন্যতা অনুভব করিয়াছিল, এই নিশীথ রাত্রে তাহাকে বুকের মাঝে ফিরিয়া পাইতেই সেই শূন্যতা কোন্ মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়া আনন্দের বিমল ধারায় তাহা উপচাইয়া পড়িল। গ্রামের প্রত্যেক যায়গা, প্রত্যেক বাড়ী, বন বাদাড়—যাহা সারাদিন তাহার চক্ষে অভিশপ্ত দেশেরই একটা অঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাকে কোলে পাইয়া সে ভাবটা তাহার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া নিখিলবিশ্ব একটা বিরাট শান্তি-নিকেতন বলিয়াই তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে আনন্দের লহর লইয়া উমাকে জিজ্ঞাসা করিল—থাকতে পারলি না তোর বাবার কাছে ?

উমা বলিল—উহুঁ।

এই সামান্য কথাটা তাহার মুখ দিয়া এমন ভাবে বাহির হইল, যাহা শুনিয়া পদ্মর মনে হইল—সেই কোন্ সকাল হইতে এতটা রাত্তির পর্য্যন্ত কতখানিই না মর্ম্ম যাতনা তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল! এখানে পলাইয়া আসিবার জন্য কতখানি উদ্বেগ কতখানি ব্যাকুলতাই না তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল!......

মাতাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া উমা তাহার ব্যথিত চক্ষু দুটী পদ্মর মুখের উপর ফেলিয়া বলিল—সারাদিন তুই আমায় আন্‌লিনি কেন মা?

তাহার এই এত বড় বা এত ছোট অভিযোগের কি যে উত্তর দিবে পদ্ম তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া যেন কতকটা অপ্রস্তুতের মতই পড়িয়া রহিল।...

স্ত্রীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রূপো বলিল—ঘুমো রে উমা ঘুমো! রাত অনেক হয়েছে।

উমা তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—গল্প বল, শুন্‌তে শুন্‌তে ত ঘুম আসবে।

আনন্দের সহিত রূপো জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ গল্পটা শুনবি মা?

—সেই চম্পাবতি আর কেয়াবতির কথা,—হাসলে যাদের মুখ দিয়ে চাঁপা আর কেয়া ফুল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ত।

রূপো তাহার গল্প আরম্ভ করিতেই, পদ্ম বলিয়া উঠিল—এত আর জড়াস নি মিন্সে! তোকে খেয়ে ফেলেছে একেবারে।

হাসিয়া রূপো বলিল—ধান ভানাটা আজ তোর বেড়ে গেছলো কেন পদ্মরাণি! না জড়াবার ফল—না?

এই কথাটার কি একটা উত্তর দিতে যাইয়াও পদ্ম দিতে পারিল না, উমার প্রাণে যদি কিছু একটা দাগ পড়িয়া যায়!...

রূপোর রূপকথা শুনিতে শুনিতে উমা কখন ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না।

পদ্ম বলিল—ঘুমিয়েছে আর বলতে হবে না।

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই রূপো বলিল—এরই মধ্যেই ঘুমুলো! শুনলে ...না সবটা!...থাক কাল সকালে বলা যাবে এখন।

পরদিন একটু বেলা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্ম যখন উমাকে লইয়া রাসবিহারীর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন জয়ন্তির এই কথাটা তাহার কানে আসিল—"এমন দুর্ব্বল হলে ত চলবে না, বাপ তুই, মেয়ের উপর তোর জোর থাকবে না? দিয়ে এলি আবার বাগ্‌দীর বাড়ীতে? দিয়েই যদি আসবি তবে নিয়ে এলি কেন?"

কথা গুলো পদ্মর মত উমার কাণে যাইয়া পৌঁছিতেই সে ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—চল্ মা পালিয়ে যাই, এ বাড়ীতে থাকব না আমি।

পদ্ম কিন্তু তাহার কোনও উত্তর দিল না, সে নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। জয়ন্তির কথা কাণে আসিতেই তাহার মনে তখন কেবল এই কথাটাই জাগিতেছিল—হা রে নিমকহারাম! গায়ের রক্ত জল করে যাকে, তোদের অতিবড় আপনার বল্‌তে সুযোগ দিয়েছে, তাকে একটা রাত্তির দিয়ে আসবার দুর্ব্বলতা দেখতে পেয়ে, যা ইচ্ছে তাই বলবার স্পর্দ্ধা রাখিস্ তোরা?

এই শোনা কথাটা তাহাকে এতখানি জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, বেশ করিয়া গোটা কয়েক কথা এই বুড়ীটাকে শুনাইয়া দিয়া আসে। কিন্তু যখনই আবার মনে হইল উমার উপর অধিকার তাহার কতটুকু, যাহার বলে সে এতখানি কথা বলিতে যাইতেছে!—তখনই সে নিজেকে সামলাইয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক গাঙ্গুলীর কোলে উমাকে দিয়া বলিল—এই নাওগো দা'ঠাকুর!...

এই সামান্য কথাটা বলিবার এবং উমাকে কোলে দিবার ভঙ্গি

গাঙ্গুলীকে একটু বেশ চঞ্চল করিয়া তুলিল, ভয়ও একটু হইল এইজন্য, যে, পিসিমার এই কথাগুলো পদ্মর কানে যাইয়া যদি একটা মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে !...

উমাকে কোলে দিয়া, পদ্ম কোনও উত্তরের আশা না করিয়াই বাহিরে যাইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই, ব্যস্তভাবে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন—শুনে যা দিদি ! শুনে যা !

ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা না থাকিলেও গাঙ্গুলীর আহ্বানের মধ্যে পদ্ম এমন একটু কাতরতা বুঝিতে পারিল, যাহাতে সে না ফিরিয়াও থাকিতে পারিল না।

ধীর গম্ভীর ভাবেই রাসবিহারী বলিলেন—উমা আমারও নয়, পিসিমারও নয় দিদি ! উমা তোর।...আজ যদি—

তাঁহার কথা অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য করিল—পদ্মর চক্ষের জল। ব্যস্ত ভাবেই নিজের বক্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন—তুই কাঁদছিস্ দিদি ?—দোহাই ভগবানের, কাঁদিস্‌নি তুই ! তোর এতটুকু চোখের জলে, তোর উমার মস্ত বড় অকল্যাণ হবে !......

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া পদ্ম বলিয়া উঠিল—ষাট্ ! অকল্যাণ হবে কেনে গো দাঠাকুর ! ও রাজরাণী হ'য়ে, আমার মাথায় যতগুলো চুল তত বছরের পেরমাই নিয়ে বেঁচে থাক্।......

গাঙ্গুলী বলিলেন—আজ তুই বাড়ী থাকবি ত দিদি ?

—কেন ?

—মেয়েটা দুপুর বেলা ছট্‌ফট্ করে, নিয়ে যেতুম সে সময়টা।

—রাখতে যদি না পার দা'ঠাকুর! তবে সন্ধে বেলা রেখে এসো। দু'একদিন এখান ওখান করতে করতে মন পড়ে যাবে।

পদ্ম চলিয়া গেল।

সমস্ত দিনটা উমা তাহার ব্যথাতুর অন্তর লইয়া পিতার নিকট কাটাইয়া দিল, কিন্তু সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পদ্মর কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য অস্থিরতার উন্মাদনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।...গাঙ্গুলীকে ধরিয়া বসিল—চল্‌না বামুন বাবা! আমাকে রেখে আসবি। মায়ের জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।

স্নেহ শীতল কণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিলেন—জল খাওয়া হোক্ আগে?

পদ্মর নিকট যাইবার জন্য যে আশার পাহাড়, উমা তাহার বুক খানার ভিতর গড়িয়া তুলিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তটাকেই অতি কষ্টে কাটাইতেছিল, আহারাদির পর জয়ন্তি সেটাকে ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু করিয়া দিলেন।

অজাতের বাড়ী পাঠাইবার ভীষণ আপত্তি তুলিলেও, গাঙ্গুলী যখন সে গুলিকে একটী একটী করিয়া খণ্ডন করিতে যাইয়া যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে লাগিলেন, তখন এই আট বৎসরের উমা কি জানি কেমন করিয়া বলিয়া উঠিল—বামুন বাবাকে তুই এমন করছিস্ কেন ঠাকুমা!—আমি যাব না। বলিয়াই সে গৃহ-মধ্যে রচিত শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

তাহার নিকটে যাইয়া জয়ন্তি বলিলেন—চল্ দিদি— তুই আমার কাছে—

দৃঢ়ভাবে উমা বলিয়া উঠিল—না,—আমি বামুন বাবার কাছেই থাকব।

উমার বিরহে—রূপো ও পদ্মরাণী।

"ওগো! সন্তানহারা হ'য়ে মা কতক্ষণ বাঁচে?"

জয়ন্তি বলিলেন—লুকিয়ে যাবার......

দীপ্ত কণ্ঠে উমা বলিয়া উঠিল—না যাব না।......

গাঙ্গুলী বাহিরের দাবা হইতে ধীর ভাবেই বলিলেন—দু'দিন আমার কাছে থেকে যদি মনটা ওর পড়ে, তবে থাক্ পিসিমা,...দু'দিন পরে ত তোমার কাছেই ও থাকবে।

হাসিয়া পিসিমা বলিলেন—তা থাক্, তবে রেখে আসিসনি যেন।...

সমস্ত রাত্রিটা উমা ভালরূপ নিদ্রা যাইতে না পারিলেও, এবং গাঙ্গুলী পুনঃ পুনঃ রাখিয়া আসিবার কথা বলিলেও, সে কিন্তু কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না।......

উমার মত পদ্মও তাহার কুঁড়ে ঘর খানির ভিতর প্রতিমুহূর্ত্তেই উমার আসিবার প্রতীক্ষায় বিনিদ্র নয়নেই সময় কাটাইতে লাগিল।...বাহিরে একটা কিছুর শব্দেই রূপোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—উমা বুঝি এসেছে রে মিন্সে! দোর খুলে দেখ্ না!......

রূপোকে বলিয়া নিজেই কিন্তু ছুটিয়া গিয়া দোর খুলিয়া যখন দেখিল কেহ কোথাও নাই, তখন পুনরায় সে তাহার ছেঁড়া চ্যাটাই খানার উপর শুইয়া পড়িল।

রূপো তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এতটা উতলা হোসনি পদ্মরাণি, ঘুমো তুই! তা না হ'লে একটা অসুখ হয়ে পড়বে।

—উতলা কেন হবরে মিন্সে? বয়ে গেছে না? ঘুমুতে মন করলে এক্ষুনি ঘুমুতে পারি, তবে কি জানিস্? বলেছে সে রেখে যাবে, যদি ঘুমুই, আর ডেকে ডেকে যদি ফিরে যায়?

—ঘুমো তুই পদ্মরাণি, আমি জেগে রইলুম, আসে যদি ডাকব তোকে।

স্বামীর কথায় কোনও প্রতিবাদ না করিয়া পদ্ম বলিল—জিলিপি খেতে সে ভালবাসে, ক'খানা এনে রেখেছি, একান্তই যদি না আসে—

হাসিয়া রূপো বলিল—কাল দিয়ে এলেই হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালেই যখন জিলিপি ক'খানা লইয়া পদ্ম রাসবিহারির বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন গাঙ্গুলী প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া সিক্ত বস্ত্রে পৈঠার উপর দাঁড়াইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া উচ্চারণ করিতেছিলেন :—

"—জবাকুসুম সঙ্কাশং........ ..."

আর উমা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ লোচনে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।...পদ্মকে দেখিতে পাইয়া প্রাণের সবটুকু আনন্দ মুখের উপর ভাসাইয়া, আত্মহারার মত তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতেই, পদ্ম তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। দুঃখ ও আনন্দ পাশাপাশি থাকিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল।

কাঁধের উপর মাথাটা রাখিতেই, পদ্মর পৃষ্ঠদেশ-লম্বিত অঞ্চলের অগ্রভাগে কি একটা বাঁধা থাকিতে দেখিয়া, ঔৎসুক্যের সহিত সেটাকে খুলিয়া ফেলিতেই তাহার অতি বড় প্রিয় জিনিষগুলি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ গুলো কার জন্মে মা?

আনন্দের আধিক্য তখন তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিতেছিল।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উমা সেগুলির সদ্ব্যহারের উদ্যোগ করিতেই, জয়ন্তি কোথা হইতে চিলের মত আসিয়া তাহার হাত হইতে সে গুলিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—অমন্ কাজ করিস্নি দিদি, বাগ্দির ছোঁয়া জিনিস......

কথাগুলো শক্তিশেলের মত পদ্মর বুকে যাইয়া আঘাত করিল। কামানের আওয়াজের মত তাহার কথাগুলা আর শুনিতে না পারিয়া সে উমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদেই সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিসিমার আচরণ, গাঙ্গুলীর চক্ষে বিষের মত ঠেকিলেও, পূজনীয়া তিনি, তাঁহাকে কোনও কথা না বলিয়া সিক্ত বস্ত্রে দৌড়াইয়া যাইয়া পদ্মর হাতদুইটী ধরিয়া বলিলেন—কার উপর রাগ করছিস দিদি? উমা যে তোর! তোর এতটুকু মনদুঃখে তার যে কতখানি অমঙ্গল হবে তাকি তুই বুঝছিস্ না? তুই যে তার মা, পরের ওপর রাগ করে মেয়েটাকে এম্নি করেই তুই রেখে এলি?

পদ্মর দুই চক্ষু দিয়া প্লাবনের ধারা ছুটিল।......

গাঙ্গুলি তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া ধুলায় ছড়ানো জিনিস গুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—উমাকে কোলে বসিয়ে এ গুলো খাইয়ে যা দিদি!......

প্রতিবাদের জন্য জয়ন্তি কি একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেই গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন—উমা আর আমার দিদির সম্পর্ক 'বামুন-বাগ্দি' নয় পিসিমা, ওদের সম্পর্ক মেয়ে আর মা।

গাঙ্গুলীর এতখানি সহৃদয়তা পদ্মর প্রাণের জ্বালা কতকটা নিবৃত্ত

করিল বটে, কিন্তু জয়ন্তির ব্যবহারের খোঁচা তাহাকে এম্‌নি দুর্জ্জয় অভিমানে ভরাইয়া দিল যে, কোনও রূপে সেই ক'খানা খাওয়াইয়াই সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।......

পদ্ম চলিয়া যাইবার পর, গাঙ্গুলী পুনরায় স্নান করিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই উমা জিজ্ঞাসা করিল—ভিজে কাপড়ে কোথা যাচ্ছিস বামুন বাবা?

—স্নানটা করে আসি মা।

—এই ত এলি!

—পদ্মকে যে ছুঁয়ে ফেল্‌লুম মা!—ওদের ছুঁলে নাইতে হয়।

উমার বুকের মাঝে কিসের একটা স্পন্দন খেলিয়া গেল, সে কোনও কথা না বলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।......

পিসিমা তাহার মাথায় গঙ্গাজল দিয়া বলিলেন—ঘরের ভেতর হতে তেলের বাটীটা দে ত দিদি!...

আজিকার এই ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত উমার কুসুম কোমল প্রাণকে অস্থিরতায় নাচাইয়া তুলিতে লাগিল, এই অস্পৃশ্যা নারীটাকে লইয়া তাহার ঠাকুর মা এবং পিতা এই দুইজনের বিভিন্ন প্রকারের আচরণ, তাহাকে এম্নি একটা অস্বস্তিতে ভরাইয়া তুলিতে লাগিল, যাহার দাপটে সে একরূপ নির্জ্জীবের মতই হইয়া পড়িল, ঠাকুরমার দেওয়া খাবারের জিনিষগুলা সে একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া হতভম্বের মত বসিয়া এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল,—যে মা, তাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে কেন? তা হোক্ না সে বাগ্‌দি আর ইহারা ব্রাহ্মণ! আর এতখানি অস্পৃশ্যই যদি সে হয়, তবে তাহার নিকট লালিত ও পালিত হইয়া,

তাহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া এতবড়টা হইয়া উঠিয়াছে সে যখন, তখন সেই বা কেন ইহাদের নিকট এতখানি যত্ন লইবে ?

এই সমস্যা তাহাকে চিন্তা রাজ্যের এমন একস্থানে লইয়া গিয়াছিল, যেখানে যাইলে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া যায়—ঠিক সেই সময় গাঙ্গুলী আসিয়া স্নেহ শীতল কণ্ঠে ডাকিলেন—মা রে !

উমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল ! একটু ব্যস্তভাবেই বলিয়া উঠিল—কি বলছিস বামুন বাবা ?

—কি ভাবছিস মা ?...কাগে তোর খাবার গুলো সব নিয়ে পালাচ্ছে যে !

এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া ব্যথাতুর কণ্ঠে উমা জিজ্ঞাসা করিল—তোরা মাকে এত অপমান করলি কেন ?

—ও কথা বলিসনি মা ! তাকে অপমান করবার ক্ষমতা শুধু আমার কেন, ভগবানেরও নেই।

—কিন্তু ঠাকুরমা করে ত ?—এই কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে উমার নয়ন-পল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল।

কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাঙ্গুলী বলিলেন—তার কথা ছেড়ে দে মা, বুড়ী হয়ে পড়েছে, তার কি আর জ্ঞান আছে কিছু ?...ওঠ্ মা, আহ্নিক করবার যায়গাটা করে দে !...

এই বাড়ীখানায় বাস করা উমার পক্ষে আগুনের মধ্যে বাস করার সমান হইলেও, এই গাঙ্গুলীর ব্যবহারটাই তাহাকে কতকটা শান্তিতে রাখিতে পারিয়াছিল।

পিতার কথামত আহ্নিকের স্থান করিয়া দিয়া বাড়ীর ভিতর একটা

নিরালা যায়গায় যাইয়া সে আবার ভাবিতে লাগিল,—মাকে অপমান করবার ক্ষমতা ইহাদের কতটুকু আছে? আর তাহার মায়ের অপমান সে কেনই বা বরদাস্ত করিয়া যাইবে। যাহাকে ইহারা এতখানি লাঞ্ছনার ধিক্কারে পদে পদে জর্জ্জরিত করিয়া দিতেছে, তাহাদের উপর ইহাদের অধিকারই বা কতটুকু? মা যার, অন্যের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, কন্যার কর্ত্তব্য সেখানে কিরূপ দাঁড়াইবে!

এই চিন্তায় সে এমন ডুবিয়া গেল যে, বেলাটা যে কখন বাড়িয়া গিয়াছে—তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না।...জয়ন্তির নিকট হইতে আহারের জন্য ডাক তাহার কাণে আসিতেই যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সর্ব্ব শরীর এই নারীটির উপর ঘৃণায় এম্নি-ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল যে, তাহার দেওয়া আহার্য্য গ্রহণ করা তাহার মাকেই অপমান করিবার নামান্তর মনে করিয়া, সে একরূপ উর্দ্ধশ্বাসেই ছুটিয়া পলাইল—পদ্মর স্নেহ-শীতল ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তাহার প্রাণের বৃশ্চিক দংশন জ্বালা কতকটা প্রশমিত করিবার জন্য।......

সে যখন পদ্মর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন সে খাইতে বসিয়া-ছিল। তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উমা বলিল—আমায় দু'টী খেতে দে মা! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

পদ্ম তাহাকে তাহার স্নেহ-শীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইল বটে, কিন্তু তাহার মুখে দুটী অন্নের গ্রাস তুলিয়া দিতে যেন রাজ্যের দ্বিধা, রাজ্যের জড়তা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল! বলিল—খেতে নেই মা!

—মিছে কথা বলিসনি মা!

—না রে সত্যিই বলছি।

—হঁ! আবার মিছে কথা বলবি?—

—না রে না, সত্যি মা—খুব সত্যি।—আমাদের ভাত খেলে তোর জাত যাবে।

—জাতই যদি যাবে, তবে এতদিন খাওয়ালি কেন? আর এতদিন যে খাওয়ালি, তাতে জাতই বা আছে কোথা?

—রুদ্ধ আবেগে পদ্ম বলিয়া উঠিল—জ্বালাস্ নি উমা! উঠে বোস।...

উমা কিন্তু কোন কথা না বলিয়া নিজের হাতেই তাহার থালা হইতে তাড়াতাড়ি দুইচার গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।...

ব্যস্ত ভাবেই পদ্ম বলিয়া উঠিল—কি করছিস উমা? আমাদের ভাত খেয়ে আর জাতটা নষ্ট করিসনি মা!

উমা এ কথায় কোনও উত্তর দিতে পারিল না, একটা বিস্ময়-মাখা কাতর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া, শুধু হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার কথার উত্তর দিলেন রাসবিহারি।—তাহাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন—এতদিন তোর এঁটো খেয়েও জাত নষ্ট না হয়ে যদি থেকেই যায়, তবে আর একটা দিনে সেটা নষ্ট হবে না দিদি!...

* * * দিনের পর দিন গাঙ্গুলীর এই স্নেহ মধুর-ব্যবহার পদ্মর প্রাণকে এমনি সতেজ করিয়া তুলিল যে, পিসিমার সমস্ত ঔদ্ধত্য সে সহাস্য মুখে সহ্য করিয়া তাহাদের বাটীতে প্রাণের আশা মিটাইয়া উমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল।...

গাঙ্গুলীর কথামত জয়স্তি এই অস্পৃশ্যা নারীটীর এতখানি যথেচ্ছা-চারিতা ক্রমাগত আরও দুইবৎসর সহ্য করিয়া যাইলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন আর পারিলেন না। একটা লোকের পাগ্‌লামির জন্য, বর্ণশ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণের ঘরে এত বড় অনাচারের প্রশ্রয় দিয়া, জাতির গৌরব, অম্লান-ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে না পারিয়া, একদিন পদ্মকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন—তাঁহার বাড়ীতে পুনরায় যদি সে প্রবেশ করে, তবে যথেষ্ট অপমানিত হইয়া তাহাকে ফিরিতে হইবে।

জয়ন্তির কথায় দারুণ অভিমান পদ্মর অন্তরে মাথা খাড়া করিয়া দেখা দিল। তাহার মনুষ্যত্বের উপর—তাহার স্নেহের উপর—অধিকারের উপর এই দজ্জাল স্ত্রীলোকটার এতখানি পদাঘাত করিবার কি ক্ষমতা আছে? সে নিজে অস্পৃশ্যা বলিয়া কি? তাই যদি হয়, তবে যে বারবার এই অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়া—এম্‌নিভাবে কুকুরের মত তাহাদের বাড়ীতে আসিবে?...উমার মায়া? ......কেন—উমা কে তোর? একটা রক্তপিণ্ডকে বুকের রক্ত জল করিয়া এত বড়টী করিয়া তুলিবার মায়া? যাহার উপর কোনও অধিকার নাই, তাহার উপর মায়া কিসের? তাহার নিজেরও ত দুইটী হইয়াছিল, তাহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলেও কৈ সেত তাহাদিগকে একদিনের জন্যও দেখিতে পাইতেছে না! তবে পরের এই মেয়েটার জন্য প্রাণের এই আকুলি ব্যাকুলি কেন?...না, আর সে এতখানি অপমান সহ্য করিতে পারিবে না।

জয়ন্তির অপমানের ঘা পদ্মর প্রাণকে এতখানি শক্ত করিয়া দিয়াছিল যে, সে দুই একদিন তাহাদের বাড়ীর দিকেই যাইতে পারিল না। উমাকে দেখিতে যাইবার জন্য গাঙ্গুলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাহার ধানভানার কার্য্যটাকে যতখানি শিথিল করিয়া দিয়াছিল, পিসিমার হৃদয়হীন আচরণ সেই কাজটাকেই লক্ষগুণে বাড়াইয়া দিল।......

কিন্তু কর্ম্মের একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া যখন সে নির্জ্জীব অবসন্নের মত হইয়া পড়িত তখন কোন্ ফাঁকে যে সেই মেয়েটার আশৈশবের স্মৃতি তাহার হৃদয় খানাকে দখল করিয়া বসিত, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না।

কোটী কোটী বার এই চিন্তার গলা টিপিয়া মারিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও, লক্ষগুণ হইয়াই সেটা তাহার প্রাণকে তোলপাড় করিয়া তুলিত।

একদিন হৃদয়ের ঠিক এইরূপ গুরু-মাতনের সময় গাঙ্গুলী যখন উমার হাত ধরিয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কে যেন পদ্মর হৃদয়টাকে পাথরের ঘা দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। অন্য দিনের মত আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে উমাকে কোলে লইতে ছুটিয়া আসিল না। সেই খানেই ঠিক একখানি পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।—

তাহার এই ব্যবহারে তাহারই প্রাণে কতখানি দুঃখের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিয়া, গাঙ্গুলী উমাকে তাহার কোলে দিয়া ধীর ভাবেই বলিলেন—নে দিদি তোর মেয়েকে, আমি কাশীবাস করবারই ঠিক করেছি।......

পদ্ম কোনও কথা বলিতে পারিল না, উদাস দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন—মেয়েটার মুখের দিকে যদি তুই না চাস দিদি, তবে জগতের এমন কেউ নেই, যে ওটাকে বাঁচিয়ে রাখে। ক'দিন যাস্‌নি তুই, খাওয়া দাওয়া ত এক রকম ত্যাগই করেছে, পাছে পিসিমা দেখতে পান, সেই ভয়ে নির্জ্জনে বসে কেবলই কাঁদছে।...একদিনে চেহারাটা কি রকম হ'য়ে গিয়েছে একবার ভাল করে দেখ্ দেখি।......

পদ্ম বলিল—দু'দিন পরেই সব ভুলে যাবে দাদাঠাকুর!

হাসিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন—চোরের ওপর রাগ করে মাটীতে ভাত খাবি দিদি?—ওঠ্—চল—

পদ্মর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। চোখের কোণ দিয়া কেবল দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর হইতে পদ্ম পুনরায় রাসবিহারীর বাটী যাইয়া পদ্মকে দেখিয়া আসিতে লাগিল। জয়ন্তি ইহার জন্য খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেও, গাঙ্গুলী যখন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন "এর পরও যদি পদ্মর উপর এতটুকু অসদ্ব্যবহার করা হয়, তবে তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবেন —তাঁহাদের কোন সংস্রবের মধ্যেই তিনি থাকিবেন না।" তখন এই খামখেয়ালি ব্যক্তির কখন কি করিয়া ফেলিবার ভয়ে, পদ্মকে কোন কথা বলিতেন না, বরং এই বিচ্ছেদের ভয়টাতেই পদ্ম কোনও দিন না আসিলে তাহার অনুসন্ধানের জন্য জয়ন্তিকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার আচার নিষ্ঠা খুব কমিয়া গিয়াছিল তা নয়। পদ্ম আসিলে উমা যতবারই তাহার ক্রোড়ের মধ্যে ছুটিয়া যাইত ততবারই তাঁহার খরদৃষ্টি উমার উপর এম্নিভাবে পতিত হইত যে,তাহাকে স্পর্শ করিবার পর ঘরের কোনও জিনিষেই সে হাত দিতে পারিত না, যতক্ষণ না পদ্ম চলিয়া গেলে তাহার মস্তকে গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হয়।

জয়ন্তির এই ব্যবহার ক্রমশঃই উমার প্রাণের মধ্যে এমন একটা সমস্যার উদ্ভব করিয়া তুলিল যে, তাহার মীমাংসায় যতই সে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, ততই যেন থেই হারাইয়া ফেলিতে লাগিল। সে

কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এই সংসারটীর মধ্যে ছোঁয়া লেঠার এতখানি বাঁধাবাঁধি কেন ?...পদুর বাড়ীতে যখন সে থাকিত, কৈ তাহাদের মধ্যে এতখানি বাঁধাবাঁধি ত দেখে নাই। গ্রামশুদ্ধ লোকের, এমন কি ছকু ডোমের বাড়ী খেলাইয়া আসিলেও গঙ্গাজল স্পর্শ করা ত দূরের কথা, হাত মুখ ধুইবার জন্যও কেহ তাহাকে বাধ্য করিত না, তবে এখানেই বা কেন এমনটা হয় ?...অথচ ইহাদের এতখানি শুচিতার অজুহাত—গ্রামের সমস্ত নীচ জাতের উপর যে জমাট বাঁধা ঘৃণা, সকলে তাহা জানিয়াও ইহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য দেয় কেন ?......

সমস্যাটা যখন বেশ ঘোরাল হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করিল, তখন সে একদিন পদুর বাড়িতে পদুরই কোলে মাথা রাখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পদু বলিল—ওরা যে বামুন—দেবতা।

—তাই বুঝি তো'দিকে এতখানি ঘেন্না করে ?

—না, ঘেন্না করবে কেন মা ? সে জিনিষটা আলাদা।

—নাই যদি করবে, তবে তো'দিকে ছুঁলে গঙ্গাজল নেয় কেন ? আর ঘাটকুলে যেয়ে নেয়েই বা আসে কেন ?

—ছুঁলে যে নাইতে হয়।

—কেন ?

—ভগবান যে এই নিয়মই করে দিয়েছেন মা !—তাঁরা বড়, আমরা ছোট,...দেবতাদের নীচেই তাঁদের যায়গা।

"ও......" বলিয়া উমা নীরব হইয়া গেল, সে আর একটা কথাও বলিতে পারিল না।

তাহাকে এতখানি নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—চুপ্ করে রইলি যে?

উমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া এই প্রশ্নটাই বাহির হইয়া পড়িল,—তা হ'লে আমিও বামুন?

তরল হাস্যে পদ্ম বলিল—নয় ত বাগ্দী না কি?

—তা হ'লে তোকে ছুঁলে আমাকেও নাইতে হয়?......ভগবান এই নিয়ম করে দিয়েছেন বল্‌ছিলি না?

পদ্মর প্রাণের মধ্যে একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল! মুহূর্ত্ত মধ্যে সেটাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—হয় বৈকি।

হাস্যের তারল্য ছড়াইয়া উমা বলিল—কিন্তু তুই যে আমার মা!

উমার উছল-আনন্দ এবং বলিবার ভঙ্গি, এমন একটা আনন্দের ধাক্কা পদ্মর কণ্ঠে ঠেলা মারিয়া দিল, যে, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

উমা যখন পথে বাহির হইয়া পড়িল, তখন পৃথীবীর বুকে আলো আঁধারের খেলা চলিতেছিল—খুবই গম্ভীরভাবে।

ঠিক এই সন্ধ্যার অন্ধকারের মত চিন্তার একটা জমাট বাঁধা অন্ধকার উমার হৃদয়ের মধ্যে দেখা দিয়া, তাহাকে যেন কেমন একরকম করিয়া দিতেছিল।

এই দুইটী পরিবারের আচার-ব্যবহার-রীতিনিতি যতই তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, ততই যেন সে দিশেহারার মত হইয়া পড়িতে লাগিল! সেদিনকার পিতার আচরণ, পদ্মর মনদুঃখ দূর করিবার জন্য অতি কাতরভাবে তাহার হাত দুইটী ধরা এবং পদ্ম চলিয়া যাইবার সঙ্গে

সঙ্গে পুনরায় স্নান,—আজ তাহার মনে কে যেন জাগাইয়া দিল,—পিতা তার কতখানি উদার কতখানি মহৎ! আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কৈ তিনি ত মাকে এতটুকুও ঘৃণা করেন না।—

আজ পদ্মর কথায় সে প্রথম বুঝিতে পারিল, এতদিন যাহাদের ঘরে সে মানুষ হইয়াছে, তাহারা ছোট—অস্পৃশ্য, আর যিনি পিতার অধিকার লইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন—তিনি ব্রাহ্মণ—দেবতা।

হঠাৎ তাহার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িয়া গেল—পাড়ারই একটী ছেলের ডাকে। উমাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—বাগ্‌দি বাড়ী ভাত খেয়ে এলি?

একটা রোষপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া উমা বলিল—তোর কি?

ছেলেটী বলিল—এত বড়টা হয়েও নিজের জাতটা বুঝতে শিখলি না উমা?—বাপকে যে তোর সবাই মিলে একঘরে করবে—কেউ কি আর তার সঙ্গে খাবে?—যাদিকে ছুঁলে নাইতে হয়, তাদের বাড়ী...

এই ছেলেটীর কথা তাহাকে অন্যমনস্কতায় ডুবাইয়া দিল। সেইভাবেই সে বলিল—এই যে জাতের কথাটা তোমরা আজ আমায় শোনাচ্ছ, সেও সেই ছোট জাতেরই দয়ায়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই উমা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল—প্রাণের মধ্যে ঝড়ের একটা মাতন লইয়া।

যখন সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল, গাঙ্গুলী তখন দাবায় বসিয়া পিসিমার সঙ্গে উমার সম্বন্ধেই কি কথা বলিতেছিলেন। কন্যাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—কোথা গিয়েছিলি রে মায়ি?

পিতার এই স্নেহ আহ্বানে তাহার প্রাণের সমস্ত মাতন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে যেন কেমন একরূপ হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার একটা কথাও বাহির হইল না। কেবল একটু মিনতি ভরা দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন—আহ্নিক করবার যায়গাটা করে দে মা!—এখনও যে সন্ধ্যা করতে পাইনি!

একটা কথাও না বলিয়া—উমা তাড়াতাড়ি পিতার জন্য পূজার আসন করিয়া দিতে সিঁড়ির একধাপ্ উঠিয়াই, হঠাৎ তাহার পা দুখানা অচল হইয়া গেল।......

জয়ন্তি বলিলেন—দাঁড়ালি কেন দিদি?

উমা বলিয়া উঠিল—মাথায় একটু গঙ্গাজল দে ত ঠাকুমা!

উমার কথায় জয়ন্তির প্রাণে তৃপ্তির একটা মন্দাকিনী ধারা খেলিয়া গেল—এই ভাবিয়া, যে, এতদিন পরে আজ প্রথম উমা নিজেই তাহার শুচিতা রক্ষার্থ গঙ্গাজল স্পর্শের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তাহার অনুরোধ রক্ষার জন্য জয়ন্তিদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, গাঙ্গুলী বলিলেন—গঙ্গাজল কেন মা?

—মায়ের কাছে গিয়েছিলুম।

গাঙ্গুলী বলিলেন—মা চিরকালই মা—উমা!......তিনি জাতের বাহিরে।

পিতার কথা উমা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া উদাস দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন—যে পদ্ম তোর অস্তিত্বটাকে এতদিন

রূপো ও পদ্মরাণী।

পদ্মর স্বপ্নময় তন্দ্রা—রূপোর জাগ্রত চিন্তা।

পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে উমা ! সেই পদু যতখানিই অস্পৃশ্যা হোক না কেন, সে তোর মা, আর সবার পক্ষে যাই হোক্ তোর পক্ষে তার জাতি-বিচার চলে না।

এতদিন ধরিয়া পদুকে উপলক্ষ করিয়া জয়ন্তি দেবীর নিকট সে যত-টুকু শিক্ষা পাইয়াছে এবং আজ অপরাহ্নে পদুর নিজের মুখেই বড় ছোটর পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া সে নিজে যতখানি তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থির করিয়া লইয়াছিল, পিতার কথায় সেটা এলোমেলো হইয়া গেল, এই চিন্তাটাই তাহাকে ভরপুর করিয়া দিল, যে মায়ের ছায়া স্পর্শ করিলে বাবাকে স্নান করিতে হয়, সেই মায়ের কোলে উঠায় তাহার কোনও দোষ নাই,......যদি নাইই, তবে তাহাকে স্পর্শ করিলে ঠাকুমা প্রত্যেক-বারই গঙ্গাজল দিবার জন্য এতখানি ব্যস্ত হইয়া উঠেন কেন ?

তাহার এই চিন্তার মাঝপথেই জয়ন্তিদেবী আসিয়া তাহার মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিতেই সে তাহার কচি প্রাণখানিকে সমস্যায় পূর্ণ করিয়া, পিতার জন্য পূজার জায়গা করিয়া দিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। কণ্ঠে পুলক মাখাইয়া জয়ন্তি বলিলেন—দেখ্‌লি রাস্থ ! দিদি আমার নিজেই বুঝতে শিখেছে বাগ্দিকে ছুঁলে স্নান কর্‌তে হয় ?

পিসিমার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া গাঙ্গুলী মাত্র একটু হাসিয়া বসিয়া রহিলেন।

গৃহান্তর হইতে উমা ডাকিল—পূজোর জায়গা হয়েছে বাবা !

গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন,—তাঁহার প্রাণের মধ্যে তখন কোনও কিছুরই ভাব খেলিতেছিল না, শ্মশান-বৈরাগ্যেরই মত একটা ভাব তাঁহার সমস্ত হিয়ার পরতে পরতে বসিয়া গিয়াছিল।...

পূজা করিবার সময় উমা অনেক দিনই পিতার পার্শ্বে বসিয়াছে, আজও বসিয়া রহিল—কিন্তু আজ সে মুগ্ধ হইয়া গেল—পূজারত পিতার মুখে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি খেলিয়া যাইতে দেখিয়া! আপনা আপনি তাহার শির নুইয়া পড়িল—এই পিতার পদপ্রান্তে।...

* * * অনেকটা রাত্রি পর্য্যন্ত উমা কেবল নিজেকে এই চিন্তাতেই মগ্ন করিয়া রাখিল, যে, মা ছোট জাত হইলেও তাহার মা, তাহার স্তনদুগ্ধে সে এত বড়টী হইয়া উঠিয়াছে, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সে যত বড় অস্পৃশ্যই হোক না কেন—তবুও তাহার মা, —পিতার এই উপদেশ।......

দেবতুল্য পিতার এই উপদেশ যতবারই সে আলোচনা করিতে লাগিল ততবারই, তাহার চক্ষের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল—মায়ের দিকটা না ভাবিলেও তাহার নিজের যে একটা দিক আছে সেই দিকটা ভাবিলেও তাহার পক্ষে কোনটা কর্ত্তব্য! কালস্রোত তাহাকে যেদিকে টানিয়া আনিয়াছে, যাহাদের সমাজে তাহার বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে, তাহাদের রীতিনীতি পালন করা? না তাহার অতীত জীবন যাহাদের সংস্পর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের আচার ব্যবহার মানিয়া চলা?

এই দুই চিন্তা তাহাকে একরূপ পাগলেরই মত করিয়া দিল। অথচ তাহার মনগড়া মীমাংসার মাঝখানেই পিতার নূতন রকমের উপদেশ তাহার সবটা ওলট পালট করিয়া দিয়া আবার একটা নূতন করিয়া মীমাংসা করিবার পথে টানিয়া আনিল।...কোন্ দিকে যাইবে—কোন্ পথ অবলম্বন করিবে সে!

কন্যাকে এতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া স্নেহাতুর কণ্ঠে গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিলেন—এখনও যে ঘুমুসনিরে মায়ি ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া একটু দ্বিধা ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল —মায়ের যদি কোনও জাত বিচার নাই-ই থাকে বাবা, তবে সেখান হ'তে আমায় টেনে নিয়ে এলে কেন ?

—আজ তোর এ ভাবনাটা কেন এল বল্ দেখি মা ?

—অমনি জিজ্ঞাসা করলুম বাবা।

—চিরদিন ত তোকে রাখতে পারব না মা !...বে থা দিতে হবে, তোর উপর যে কর্ত্তব্য, সেটা যে পালন করতেই হবে মা ! অথচ সেখানে থাকলে সেটায় অনেক বিঘ্ন হবে।

—এইজন্যে ?

—হ্যাঁ মা !

—ও,...উমা আর কোনও কথা বলিল না।...

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর সাতটী দিন কাটিয়া গিয়াছে পদুর কোলে ছুটিয়া যাইবার জন্য উমার অন্তরে কামনার তরঙ্গ উঠিলেও, একটি দিন একটী বারের জন্য সে তাহার নিকট যায় নাই, যাইবার জন্য অনেকদিন অনেক বার সে অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু সে দিনকার সেই ছেলেটীর নিকট শোনা পিতার একঘরে হইবার ভয় তাহার গমনপথের পুরোভাগে প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে।

পদুও তাহাকে এ কয়দিন না দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই গাঙ্গুলী-বাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু একটী দিনের জন্যও সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই, যতবারই সে আসিয়্যছে ততবারই দেখিয়াছে উমা বাড়ী নাই।

তাহার এই এতখানি পরিবর্ত্তন পদুর হৃদয়ে ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল। বুকের মাঝে কান্না গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলেও উমার চিন্তা পদুর অন্তরকে এম্নিভাবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল যে, সে তাহার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা ভুলিয়া কেবল এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল—কি হইল উমার? কেন আসিতেছে না সে? একটা ভাবি আশঙ্কার কালো ছায়া তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখা দিতেই সে হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। উমা কি তাহার নিকট আর আসিবে না! আর তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না?

সে তাড়াতাড়ি রাসবিহারীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাইবার উদ্যোগ

করিতেই, প্রাঙ্গন হইতে রূপো জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাচ্ছিস্ পদ্মরাণী ?

পদ্ম সে কথায় কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটাকে দেখে এলি ? ক'দিন ধরে আসছেও না—সেখানে যেয়েও দেখ্‌তে পাচ্ছি না তাকে...

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া রূপো বলিল—মেয়েটার মায়া কাটাবার চেষ্টা করছি পদ্মরাণী, যে আমাদের নয়......

—এই পর্য্যন্ত বলিয়া রূপো তাহার বাকি কথাটাকে প্রকাশ করিয়া বলিল না, বা বলিতে পারিল না।...এই অন্ধকার রাত্রে পদ্ম যদি তাহার মুখ খানাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত যে, রূপোর চোখের কোণ দিয়া কতখানি জল গড়াইয়া পড়িয়াছে !...

—"কাটাতে চাইলেই কি কাটান যায় র‍্যা মিন্সে ?" বলিয়া পদ্ম সিঁড়ির একধাপ নীচে নামিয়া আসিল।...

রূপো জিজ্ঞাসা করিল—এই এত রাত্তিরে কোথা যাবি পদ্ম ?

—"এক্ষুনি আসছি" বলিয়া সে প্রাঙ্গনে নামিয়া পড়িতেই, রূপো তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল—এই রাত্তিরে আর যাসনি পদ্ম, কাল সকালে যাস।

পদ্ম কিন্তু তাহার কথা না শুনিয়া গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিল। রূপো আর পদ্মকে কোনও কথা বলিতে পারিল না, দাবায় বসিয়া নিজেকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবাইবার জন্য আপন মনেই গান ধরিল :—

"সংসার রাঙ্গা ফলে ভুলিব না মা এবার—
খাইয়ে দেখেছি তায় নাহি কোনও সুতার।"

* * * পদ্ম যখন গাঙ্গুলীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন উমা দাবায় বসিয়া পিতার নিকট ব্রাহ্মণ কতখানি শ্রেষ্ঠ—একসময়ে দেবতাদের উপরেও কতখানি প্রভাব তাহারা বিস্তার করিয়াছিলেন, এমন কি ভগবানের বুকে পদাঘাত করিলেও তিনি কতখানি আগ্রহ লইয়া ভৃগুমুনির পা ধুয়াইয়া দিয়াছিলেন—ইত্যাদি বিষয় শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়াই বলিতেছিল—তারপর ?...পদ্ম যে কখন প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে বিষয়ে অন্য দিনের মত তাহার দৃষ্টি ছিল না। এই কথাটাই তখন তাহাকে জগতের বাহিরে লইয়া গিয়াছিল যে, যে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে ! সেই ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ দেবতা ! মাও ত সেই কথাই বলিয়াছিল—বামুন দেবতা। তাদের মত আচারহীন ছোট জাতের সংস্পর্শে আসিলে স্নান করিতে হয়।......

পদ্মকে দেখিতে পাইয়া রাসবিহারী কন্যাকে বলিয়া উঠিলেন—তোর মা এসেছে রে উমা !

আনন্দ বিচ্ছুরিত কণ্ঠে একমুখ হাসিয়া উমা বলিয়া উঠিল—এই যে মা !

পদ্মর প্রাণের মধ্যে আনন্দের লহর খেলিয়া গেল ! এই ডাকটী শুনিবার জন্যই যে সে হৃদয়ের সমস্ত আকুলতাকে জড় করিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে ! কিন্তু যখন সে দেখিল—উমা অন্যদিনের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল না, তখন কণ্ঠে উৎকণ্ঠা মাখাইয়া কাতর ভাবেই বলিয়া উঠিল—আয় উমা আয়—আয় !

পদ্মর কথা উমার চক্ষুকে সজল করিয়া, তাহাকে একটা বিরাট ব্যাকুলতায় ভরাইয়া দিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন—ওকি রে উমা ? যা যা, তোর মা যে !

পদ্ম তাহার হাত দুইটী প্রসারিত করিয়া ডাকিল—আয় মা ! আয় !...

পদ্মর ব্যাকুলতা, পিতার আদেশ, উমার প্রাণকে অনেকখানি গলাইয়া দিল। সে পদ্মর কোলে যাইবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতেই, কতকটা পথ অগ্রসর হইয়াই আবার থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।......পদ্মর কিন্তু এতটুকু লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা ছিল না, সে ছুটীয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

উমা তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীরব হইয়াই রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ তাহাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন যাসনি কেন উমা ?

উমা এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে সেইরূপই চুপ করিয়া রহিল।

হাসিয়া বলিল—এইবার বুঝি বুঝতে পেরেছিস উমা, যে আমরা বাগ্দি ?

এ কথারও উমা কোনও উত্তর দিল না, তাহার কথার উত্তর দিলেন গাঙ্গুলী। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—তুই যাই হ'না কেন দিদি, ওর মা।

উমার এতখানি নীরবতায় পদ্মর প্রাণে যে একটা গুরুভার চাপিয়াছিল, গাঙ্গুলীর কথায় সেটা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শান্তির সুবিমল ধারায় ভরিয়া উঠিল, বলিল—উমা কি সেটা মান্‌তে চাইবে ?

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন—সে কি দিদি—মানবে না কি ? যদ্দিন ও

বাঁচবে তদ্দিন যে তোর ছবিটাই ওর চোখের সামনে দিন-রাত ধ্রুব তারার মত দপ্ দপ্ করে জ্বল্‌বে।

উছল আনন্দে পদু বলিয়া উঠিল—মনে রাখ্‌বে বৈকি দা'ঠাকুর! উমা কি আমার সেইরকম গা?

উমার মুখ দিয়া এতটুকু হাসি বা এতটুকু কথা বাহির হইল না। এক এক বার পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া, মাথাটাকে আবার পদুর স্কন্ধের উপর ফেলিয়া আঁচলে বাঁধা জিনিষটাকেই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।......

পদু বলিল—খুলে নেনা মা, তোরই জন্যে এনেছি।

উমা সেগুলাকে খুলিবার জন্য এতটুকুও চেষ্টা করিল না দেখিয়া, পদু নিজেই খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—কাল যাস্ উমা, তোকে একদিন না দেখলে চারধার আঁধার দেখি রে!

চঞ্চল কণ্ঠে উমা বলিল—তা খাবোখন, কিন্তু তুই এ খাবার-গুলো আর আনিস্ নি মা!

দম বন্ধ করিয়া পদু বলিল—কেন মা?

—মিছিমিছি পয়সাগুলো নষ্ট করবি কেন? এখানে ত আমার খাবার কিছু কষ্ট হয় না!

পদুর সম্পূর্ণ অজানিত ভাবেই তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, বলিল—পয়সা নষ্ট হবার কথা বলছিস উমা! কিন্তু পয়সা উপায় করাও যে এরই জন্যে।

উমা কোনও কথা না বলিয়া তাহার গলাটাকে জড়াইয়া ধরিল। পদু বলিল—খেয়ে নে না মা ওগুলো।

—খাব'খন মা, এই ভাত খেলুম।......

আমার সঙ্গে খা মা!—বুকটা আমার ঠাণ্ডা হোক।

—তোর দেওয়া জিনিষ কি আমি খাব না মনে করেছিস মা? তোর খেয়েই যে এত বড়টা হয়েছি! এই খেলুম, ভরা পেটে খেলে যদি অসুখ করে?

বাধা দিয়া পদ্ম বলিল—তবে ভাল করে রেখে দে মা, কাল সকালে খেয়ে আমার ওখানে যাবি, কেমন?

ছোট্ট কথায় উমা উত্তর দিল—আচ্ছা।

অন্তরের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া পদ্ম চলিয়া গেলে, উমা পাতায় মোড়া সবগুলি খাবার প্রাঙ্গনে শায়িত কুকুরটার মুখের কাছে ধরিয়া দিয়া জয়ন্তিকে বলিল—দাঁড়াবি চল ঠাকুরমা! আমি নেয়ে আসি।

হাসিয়া জয়ন্তি বলিলেন—নাইতে হবে না দিদি, গঙ্গাজল নে,...... বলিয়া উঠিয়া যাইতেই, গাঙ্গুলী ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—তোর কাছে সে ওই কুকুরটার চেয়েও অধম হ'ল মা?

পিতার কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর নিবদ্ধ করিতেই, গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিলেন—কুকুরটাকে ছুঁয়ে ত কোনও দিনই তুই গঙ্গাজল নিসনি মা!......

উমার নয়ন পল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল, একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

* * * গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পরিপূর্ণ আনন্দেই পদ্ম স্বামীর নিকট উমার ব্যবহারের সমস্ত কথা একটী একটী করিয়া বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া গেল।

স্ত্রীর এতখানি আনন্দে রূপো যোগ দিতে না পারিলেও, তাহার প্রাণে ঘা লাগিবার ভয়ে উমার ব্যবহারের কথা শুনিয়া ভবিষ্যতের ছবিটা সে যাহা দেখিতে পাইতেছিল—সেটা আর প্রকাশ না করিয়াই বলিল—দুটী খেতে দে পদ্মরাণী! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

স্বামীর কথায় পদ্মর চমক ভাঙ্গিয়া গেল; একটু লজ্জিত ভাবেই বলিল—এ বেলা যে কিছুই হয় নি গো! একটু বোস, রান্নাটা চড়িয়ে দিচ্ছি এখুনি।

রূপো কহিল—এত রাত্রে আর রান্না চাপিয়ে কাজ নেই পদ্ম, 'হরিমটরই' করা যাক্ আজ।

শয্যার আশ্রয় লইয়া রূপো বলিল—একটা ভারি সুবিধে পাচ্ছি পদ্ম!

কি?—

গোপালপুরের জমিদারের গোমস্তা সেদিন বল্‌ছিলেন—সেখানে যদি বাস করি, তবে বাসা বাঁধবার সব খরচ আর দশবিঘে জমি দেবে। যাবি সেখানে?

—সে ত এখান থেকে তিন ক্রোশ।

—তাতে কি পদ্ম?...দশ বিঘে জমি......"

বাধা দিয়া পদ্ম বলিল—হোক্ দশ বিঘে জমি, সেখানে ত আর উমাকে দেখ্‌তে পাব না। সেখানে দশ বিঘে জমি ভোগ করার চেয়ে এখানে ঢেঁকি ঠেঙ্গিয়ে উমাকে একবার দেখতে পাওয়া লক্ষগুণে ভাল। ......এই কথাটা তুই বুঝ্‌লিনি মিন্‌সে!—ধন-সম্পত্তি নিয়ে আমাদের হবে কি?...মরণকালে টাকা আর বাড়ীঘর—দশ বিঘে জমি—এ সব কি

তোর সঙ্গে যাবে ভেবেছিস্ ?...ওরে আমাদের এহ-পরকাল ব'ল্তে এক উমা ছাড়া আর কিছু নেই,—কিচ্ছুটিই থাক্‌তে পারে না। একটা একটা করে সব ক'টাকে যমের মুখে তুলে দিয়ে, পেটে না ধরেও যখন এই উমাকে বুকের মধ্যে পে'য়েছিলুম......

হঠাৎ রূপো পদ্মর মাথায় হাত রাখিয়া অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল —এ গাঁ ছেড়ে আর কোথাও যাবার নাম করবো না পদ্মরাণী, তুই নিশ্চিন্দি থাক্।...রাত ঢের হ'য়েচে এখন ঘুমিয়ে পড়,—আমি কি জানিনে রে,—যে, উমাই আমাদের ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো,—আমাদের বনবাদারে যুঁই মল্লিকে!...ভাঙা কুঁড়েয় শুয়ে না খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো,—তবু বিদেশের সোনাদানার লোভে ভুলেও পা বাড়াবো না। উমা হারা জীবন,—সে কি যা-তা কথা পদ্ম ?...

রূপোর দুটী চক্ষু সজল হইয়া আসিল। পদ্ম অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, রূপোও অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিতেছে।

রাত্রি তখন নিশীথ-সীমায়! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সহস্র লক্ষ জনপ্রাণীর আঁখিপাতে নিদ্রার লীলাবৈচিত্র্য ক্রীড়া করিতেছিল, শুদ্ধ সন্তান-বিরহ-ব্যথায় কাতর দীনদম্পতীরই নয়নপল্লব তন্দ্রাহারা!—

সামান্যক্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সকল কথাই বন্ধ হইয়া গেছে। দূরের জীর্ণ অশত্থ্ গাছটার জীর্ণ ডালে, নিদ্রাহারা এক পাখীর অলস কণ্ঠের আওয়াজ আসিতেছিল,—বর্ষার বাতাস, প্রকৃতির বুকের হাহাকরুণতা বহিয়া বহিয়া, সুপ্তিলগ্ন গ্রামবাসীর দুয়ারে দুয়ারে বৃথাই মর্ম্মকথা কহিবার আয়োজন করিতেছিল।

...ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়া এক ঝলক্ আলো আসিয়াই আবার

মিলাইয়া গেল।—সঙ্গে সঙ্গে মেঘের বিপুল হুঙ্কার! এ যেন দরিদ্রেরই কর্ণপটাহে আঘাতের পর আঘাতের সৃষ্টি করিতে জানে!

হঠাৎ পদ্ম বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল। স্বামীকে ডাকিল—কি গো ঘুমুলে?

রূপো জাগিয়া জাগিয়া পদ্মর মতই চিন্তার জাল বুনিতেছিল, কহিল—না তো ঘুমুই নি।...কিন্তু তুই উঠ্‌লি যে?...শুয়ে পড়, দেখছিস্‌নে—বিজ্‌লী হান্‌চে,—আকাশ বোধ করি ভেঙে প'ড়বে।...বাতাসের শব্দ শুন্‌ছিস পদ্ম!...চাল খানা টিকৃলে বাঁচি!

পদ্ম হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রূপো ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কেঁদে উঠ্‌লি কেন?—হ্যাঁরে পদ্মরাণি!—কি হ'য়েছে?—বলিতে বলিতে সেও—বিছানা হ'তে উঠিয়া, পদ্মকে নিকটে টানিয়া লইল।

দুঃখের মাঝে সান্ত্বনাই দেয়—রোদনের আভাষ। প্রিয়জনের স্নেহসিক্ত বচনই দেয়—কঠোর কষ্টের সময় শুষ্ক চক্ষুর কোণে অশ্রুর প্রবাহ ঢালিয়া!—তাই তো জগত মায়ায় বাঁধা প্রকৃতি নিয়তির নির্য্যাতনেও ক্লান্তি হারা!

পদ্ম কিন্তু সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিল না। রোদন বেগ তার বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রূপো কহিল—খুলে বল্‌?—নইলে আমি যে ভেবে সারা হ'য়ে যাই।

কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্ম বলিল—চলো আমায় রেখে আস্‌বে!...

—সে কি!—কোথায় রেখে আস্‌বো রে?

—তোমার পায়ে পড়ছি—আর আমি সহ্য করতে পারি না!...

রূপো এতক্ষণে ব্যাপার অনুধাবন করিয়া লইল।

অনুমানকে নিশ্চিত করিয়া লইবার জন্য কহিল—পষ্ট ক'রে বল্ পদ্মরাণি!...হাঁরে রূপো বাগ্‌দী তো বৈবজ্ঞি নয় যে—কান্নার সুর ধ'রে আঁতের কথা তোর টেনে বের করবে?

তখন বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে। বাতাসের সন্‌সন্ শব্দ কাণে আসিতেছিল।

পদ্ম কহিল—গাঙ্গুলী-বাড়ীতে আমায় রেখে আস্‌বি চল্!...

রূপো হাসিল।...হা-রে স্নেহ!—তোর এম্‌নি অত্যাচারই বটে! নইলে পাষাণের গায়ে পদ্মফুল ফোটে!...বলিল—পাগ্‌লামী করিস্‌নি পদ্ম!... ভাদর মাসের ঘুট্‌ঘুটে আঁধার রাত, বিষ্টি পড়ছে, মেঘ ডাক্‌ছে, বাতাসের বিরাম নাই, একটী শেয়াল কুকুর পথে বেরোয় না,—এ দুর্য্যোগে যাই কেমন ক'রে?...

পদ্ম মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো! ক'লজে ছেড়ে মানুষ কতক্ষণ বেঁচে থাক্‌তে পারে? তোমরা কি আমাকে আরো চুপ ক'রে থাক্‌তে বলো?...সারা দুনিয়াটায় পেরলয় সরু হ'য়েচে—বাতাস দোর গোড়ায় হা হা ক'রে লুটিয়ে কাঁদ্‌চে,—অথচ উমা আবার বুকে নেই এমন রাতে কোন্ মা তার কোলের মাণিক ফেলে একা থাক্‌তে পারে?...আমি যে পাগল হইনি কেন,—তাই ভাব্‌চি।

রূপো সহসা একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না।... পুরুষ, নারীর চেয়ে কঠোরতা দেখাইতে জানে,—তাই সে পদ্মর মত কাঁদিয়া লুটাইতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থলের পরতে পরতে সদানন্দময়ী উমার কলহাস্য পূরিত মুখখানা কেবলই লুকোচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছিল।......

...রূপো কহিল—হাঁরে!—পর কি কখনো আপন হয়—পদ্ম!...উমা আমাদের কে?

উত্তেজিত হইয়া পদ্ম বলিয়া উঠিল—মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্ মিন্‌সে! —মায়ের আমার অকল্যেণ হবে।...হাজার হোক্—তবু তুই তার বাপ্! ...পর!...পর?...উমা পর?...ওরে আকাশে এখনো চাঁদ সূয্যি উঠ্‌ছে —মেঘ ফেটে জল বেরুচ্ছে,—তবু—উমা আমাদের পর?...

অন্ধকারের মাঝে রূপোর ম্লান মুখখানার অতিম্লান হাসির ছটাটুকু পদ্মর দৃষ্টিগোচর না হইলেও, রূপোর হাসির কিন্তু বিরাম ছিল না। রোদনের এই বিচিত্র রূপান্তর—হাস্যচ্ছটায় জ্বলিয়া উঠিল! পদ্ম বলিল—গা আমার জ্বলে গেলরে—মিন্‌সে—সব্‌বো অঙ্গ আমার পুড়ে গেল!—তোর কি বল্ না?—বুকের রক্ত খাইয়ে তো অত বড়টা কর্‌তে হয়-নি!—তুই তার কি বুঝ্‌বি?

এম্‌নি সময় বিকট মেঘগর্জ্জন হইতেই, পদ্ম রূপোকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওরে মিন্‌সে, তুই কি পাথর হ'য়ে গেলি?...তুই কি জানিস্‌নে, —মেঘ ডাক্‌লে উমা আমার গলা জড়িয়ে না থাক্‌লে ভয়ে সারা হয়? ওরে পেটে না ধরলেও সে যে আমার সকল দুঃখুকে আড়াল ক'রে রেখেছে!......সে যে আমার বড় আগুনে জল ঢালা সাগর ছেঁচা ধন!...

উঃ—কী সে আকুলি বিকুলি!—রূপো আর স্থির থাকিতে পারিল না।—তাহার সব প্রাণের সকল সাধ-আশার বিশাল ভাণ্ডার হইতে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে-প্রশ্বাসের বাতাসে, আজ এই কথাটাই নিয়তির চরণে দরবার জানাইয়া দিল—শান্তি!—শান্তি!—শান্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর!—

হতভাগ্য আমরা—আমাদের আর কিছুই আজ প্রার্থনার নাই!—শুধু এতটুকু শান্তি !!.........

......পরণের কাপড়খানা সাম্‌লাইয়া লইয়া, উঠিতে উঠিতে রূপো বলিল—চল্ পদ্ম !—ঝড়ে জলে ডুবিয়া উলোট্ পালোট্ হ'য়ে যাক্—তবু আমরা যাবো !—চল্ !

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখনই রূপোর অশ্রুসজল চোখ দুইটার পুরোভাগে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—জয়ন্তির কুটীল মুখখানা !—অন্তরে তার জাগিয়া উঠিল—জয়ন্তির ক্ষুর-ধারের চেয়েও তীক্ষ্ণতর কণ্ঠের অতি তীক্ষ্ণ ভাষা—অত্যাচারের ব্যথা !—আবার সে ধপ্ করিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িল।

পদ্ম বিস্মিত হইয়া কহিল—বস্‌লি কেন ?...যাবিনে ?

রূপো এতক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—না পদ্ম !—যাবো না আমরা !...সে বড় কঠিন ঠাঁই পদ্মরাণি !—ওরা আমাদের বুকের ব্যথা বুঝ্‌বে না।

পদ্ম নীরবে, সেই অন্ধকারের মধ্যেই খানিকক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, হঠাৎ ঘরের মেঝেয় ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

রূপোর হাত দুইটী যেন নিশ্চল হইয়া গেছে ! কণ্ঠ-তার মূক !—বুকের মাঝে ভীষণ পাষাণের চাপ !......হা-রে—অকরুণ প্রাণহীন লোকাচার !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে, সন্ধ্যার পর, সামান্য একটু রাত্রি হইতেই, পদ্ম চলিয়া গেলে, মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্নের মাতামাতি লইয়া উমা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইটাই তাহাকে বেশী করিয়া কাতর করিয়া তুলিল, যে, যতবারই সে এই সমাজের রীতিনীতি মানিয়া চলিবার জন্য, পদ্মর স্নেহ-ছত্রে এত বড়টী হইয়া সদসৎ বিচার করিবার শক্তি সঞ্চয় করিলেও তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে, ততবারই পিতার এক একটী কথা তীরের ফলার মত তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া বহুকষ্টে সঞ্চিত দৃঢ়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া পদ্মর উপর আকর্ষণই লক্ষগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। পদ্মর প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্যই হোক অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক, একমাত্র পিতাই তাহাকে পদ্মর সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে সহস্রবার—অযুত লক্ষ ইঙ্গিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু তাহার সমাজের তাহার গ্রামের আর একজনও পিতার মতে মত দিতে পারে নাই বরং পিতার এই আচরণটাকেই অতি বড় নিন্দনীয় বলিয়া তাঁহাকে একঘরে করিবার জন্য স্পষ্ট ইসারাও করিয়া গিয়াছে।...তবে পিতার এই কথাটা উমার প্রাণে সূচের মত বিঁধিতে লাগিল;—'সে কি কুকুরটার চেয়েও অধম রে মা?'

সত্যই ত! কুকুরটাকে লইয়া রোজই ত কতবার খেলা করে সে, কিন্তু ঠাকুরমাটী তো কৈ একদিনের জন্যও গঙ্গাজল লইবার কথা বলেন নাই!

তবে যে মার দয়ায় সে পৃথিবীর আলো বাতাস বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই মাকে স্পর্শ করিলেই জগতের অশুচি একত্রীভূত হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে কেন? কিন্তু তখনই আবার এই কথাটা তাহার সমস্ত চিত্তটার উপর তোলপাড় করিয়া তুলিল যে, যে পিতা তাহাকে পদুর সম্বন্ধে এত সাবধান হইতে শিক্ষা দিতেছেন, সেই পিতাই ত কোনও দিন এতটুকু অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, স্নান করিয়া তবে অনেকটা পরিতৃপ্ত হন। তবে তাহার বেলায়ই বা এতখানি মহানুভবতা কেন? এতখানি উদারতা?...তাহাকে মানুষ করিয়াছে বলিয়া? তাই যদি হয়, তবে আমিই বা কেন এমনভাবে তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিব? অস্পৃশ্যা হইলেও সে ত তাহার মা, গর্ভধারিণী না হইলেও কোন্ দিক দিয়া সে এতটুকু ছোট বা এতটুকু অসম্মানের পাত্রী?

নির্জ্জন নিস্তব্ধ রাত্রে নিদ্রাবিহীন উমা, এমনি কত শত চিন্তার দোলায় চাপিয়া, কত দেশ দেশান্তর যে বেড়াইতে লাগিল, তাহা সে নিজে বুঝিতে না পারিলেও, অস্থিরতা তাহার সর্ব্বশরীর ছাইয়া ফেলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, পিতার নিদ্রিত দেহখানাকে ঠেলা মারিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া, এই বিষয়ের প্রকৃত বিবরণটা জানিয়া লয়। সে কতবার চেষ্টাও করিল কিন্তু তাঁহার নিদ্রিত মুখখানার দিকে তাকাইয়া আর পারিয়া উঠিল না। চিন্তার পাহাড় বুকে লইয়া সে অস্থিরতায় ছটফট করিতে লাগিল।

আরও যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। চিন্তার আতিশয্যে উমা বিহ্বল নির্জ্জীবের মত হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া

তাহার এই কথাটাই আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল—মাগো, কেন তুমি অমন বংশে জন্মেছিলে, আর কেনই বা আমায় এমন করে এত বড়টা করে তুলে ?

কথাটা এতখানি জোরেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, পার্শ্বে নিদ্রিত গাঙ্গুলী সেই শব্দে তাঁহার হৃত চেতনা জাগ্রত করিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে কন্যার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—এখনও ঘুমুসনি মা ?

উমা কোনও কথা না বলিয়া শুধু কাঠ হইয়াই শুইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে শুধু এই ভয়টাই দেখা দিতেছিল যে, পিতার নিকট হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার জন্য যদি সে তিরস্কৃত হয় !

কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গাঙ্গুলী পুনরায় বলিলেন—এখনও ঘুমুসনি উমা ? ঘুমো মা ঘুমো ! অসুখ করবে।

উমা আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। অশ্রু সজল-চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—আমায় তুমি মাকে অত ভক্তি করতে শেখাও, আর তুমি তাকে অতখানি ঘেন্না কর কেন ?

নিদ্রালস কণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিলেন—ঘেন্নাই যদি করব মা, তবে যাকে ছুঁলে নাইতে হয়, তার কাছে যাবার জন্যে তোকে এমন ভাবে শিক্ষা দেবো কেন ? তাকে কি ঘেন্না করতে পারি উমা ? সে যে তোর মা, সে না থাকলে, তোকে কি এমন করে বুকে রাখতে পারতুম রে ?......কথা কয়টা বলিতে বলিতে কিসের একটা বেদনা গাঙ্গুলীর বুকের মধ্যে যাঁতার পাথরের মত বসিয়া গেল।

ব্যথিত কণ্ঠে উমা বলিল—তবে তাকে ছুঁলে তোমরা নাও কেন বাবা ?

—সে অপরাধ ত আমার নয় মা, বরং সেটা ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দে উমা!...যে তোকে তার সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে মানুষ করে তুলেছে, তাকে ছুঁলে যে নাইতে হয়—এ কি কম কষ্ট রে? কিন্তু কি করব? যেটা করতেই হবে সেটাকে ত আর ডুবিয়ে দিয়ে ঠেলতে পারব না?

—তবে আমাকেই বা তোমরা এতখানি যত্নে......

বাধা দিয়া সহাস্য মুখে গাঙ্গুলী বলিলেন—তুই যে আমার মেয়ে উমা!

সকরুণ ভাবে উমা বলিল—কিন্তু তাদের বাড়ীতে যে খেয়ে পরে এতখানি মানুষ হলুম, তাতে ত আমার জাত গিয়েছে বাবা?

তেম্নি ভাবেই গাঙ্গুলী বলিলেন—জ্ঞানে ত আর খাসনি মা!

—আচ্ছা বাবা!

—কেন মা?

—এখন না হলেও বড় হয়ে তাকে ছুঁলে নাইতে হবে?

—তা হয়ত একদিন হবে,...ঘুমো মা ঘুমো!

—"হ্যাঁ ঘুমই" বলিয়া উমা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। আর একটা কথাও সে বলিল না।

* * * * *

রাত্রির ঘোরতর প্রলয় কাটিয়া গেছে। প্রভাত আসিয়াছে—তাহার বিপুল সাজ সম্ভার লইয়া!

পদু ও রূপো দুজনেই সমস্ত রাত্রি প্রকৃতির দুর্য্যোগের সঙ্গে অন্তর দুর্য্যোগের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

পদুর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল,—তখন সমস্ত প্রাঙ্গনটা সোণালি রৌদ্রে ভরিয়া গেছে!

পদ্মরাণী

রূপো তখন গাঢ় নিদ্রামগ্ন। পদ্ম তাহার গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—তোর আক্কেল হবে কবে রে মিন্সে?...বেলা যে দুকুর হ'তে চ'ললো!...বাজারে যাবি কখন? মেয়েটা এলে হাতে দেব—এমন একরত্তি জিনিস নেই ঘরে।...ভোব্না ময়রার তেলে ভাজা খাবার খেতে সে ভালবাসে, শীগ্গীর কিনে নিয়ে আয়!...আমি দুধ্পুকুরে হাতজালিখানা টেনে দেখি, যদি কিছু পাই; উমা আমার চ্যালাপুঁটী আস্ত ভাজা পেলে আর কিচ্ছুটি চায় না।

রূপো চোখ্ কচ্লাইতে কচ্লাইতে বলিল—তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে পদ্ম!...রাম্ গাঙ্গুলীর মেয়ে,—উমারাণী,—সে আস্বে এই ছোট-জাত বাগ্দীর কুঁড়েয় পুঁটী মাছ ভাজা খেতে? ওসব বাতিক ছেড়ে দে পদ্মরাণি!...তাকে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়ানোর পালা আমাদের সাঙ্গ হ'য়ে গেছে রে!—আর সেদিন আসবে না।

ঝঙ্কার দিয়া পদ্মরাণি বলিয়া উঠিল—বাতিক আমার না তোর? মাথা আমার খারাপ হয়নি রে মিন্সে,—তোরই হ'য়েচে।—বলি এই বাগ্দীর কোলে ব'সে শুগ্লীর ঝোল আর—পুঁটীমাছ ভাজা খেয়ে খেয়েই রাম্ গাঙ্গুলীর মেয়ে আজ তার ঘরে যেতে পেরেছে।...পদী বাগ্দিনী ছিল ব'লেই না উমা আমার আজ উমা—রাণী!...আজ বাদে কাল যখন তার বিয়ে হবে,—দেখ্বি মেয়ে-জামাই শিব্-দুগ্গার মতন এই পদীর কুঁড়েখানা আলো ক'রে দাঁড়াবে!

বলিতে বলিতে পদ্মর বুকখানা ভাবী-হর্ষের বিপুলতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।...

দাবায় বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রূপো বলিল—ততদিন কি আমরা বাঁচ্বো রে? ম'রে ভুত হ'য়ে যাবো।...

আজ আর জয়ন্তির কথাগুলি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া, এই আশা-সঞ্জীবিতা নারীকে, নিরাশার অকূল পাথারে ডুবাইয়া দিতে রূপোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইল না।.........আশাতেই দুনিয়া চলে- আশার মোহন-মন্ত্রের মোহ-পরশতার গুণেই দীন ভিখারী হইতে রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত, দিন-মাস-বর্ষ ধরিয়া পৃথিবী-বাসের মসলা আহরণ করে।

যথা সময়ে—রূপো গেল—খাবার কিনিতে, আর পদ্ম রহিল—উমার আসাপথ চাহিয়া! সে আসিলে,—তাহাকে শুদ্ধ সঙ্গে লইয়া পদ্ম দুধ পুকুরে মাছ ধরিতে যাইবে।

এক ঠোঙা খাবার হাতে রূপো বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল। কহিল—কই—মেয়েটা আসেনি এখনো?

পদ্ম ক্ষুণ্ণস্বরে জবাব দিল—না তো, এত দেরী হচ্ছে কেন—তাই ভাবচি।—কাল অত ক'রে ব'লে এলুম—

রূপো খাবারটা পদ্মর হাতে দিয়া বলিল—আস্‌বে বই কি পদ্ম!... হাজার হোক সে যে আমাদেরই উমা।...

কিন্তু বেলা বাড়িয়াই চলিল,—তবু উমার আসা-পক্ষে এতটুকু নিদর্শন পাওয়া গেল না।

রূপো প্রবোধ দিল—ব্যস্ত হ'সনি পদ্মরাণি, সে আসবেই।

পদ্ম আশাহতার মতই উঠানে বসিয়া, আকাশের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভবের হাটে হাট-বাজার করিতে আসিয়া, আজ যেন তার যথা সর্ব্বস্বই বিধির বিধানে নষ্ট হইয়া গেছে!...

ভাবনার পর ভাবনা! নানা রকম দুর্ভাবনা আসিয়া তাহার বিক্ষুব্ধ

অন্তরটাকে ক্লান্ত করিতেছিল। চিন্তার আর বিরাম নাই!—রাজ্যের দুশ্চিন্তা যেন আজ তাহারই জন্য জমায়িত ছিল!......

আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও, উমাকে আসিতে না দেখিয়া পদ্মর মনের মাঝে দুশ্চিন্তার তরঙ্গ ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল—যে. উমা একদণ্ডও তাহার কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত না, সেই উমা এমন ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কি করিয়া দূরে থাকিতেছে?...তবে কি...

পদ্মর আর চিন্তা করিবার শক্তি রহিল না, কি একটা কথা ভাবিতে গিয়াই সে খেই হারাইয়া ফেলিল। একটা অমঙ্গলের ভয়াতুর দৃশ্য তাহার চক্ষের সম্মুখে আগুণের শিখার মত লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দুই হাতে বুকখানাকে চাপিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা! মানুষ কি এতখানি নেমকহারাম হতে পারে?

তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া রূপো বলিল—কি বলছিস্ পদ্ম?

পদ্ম বলিল—মেয়েটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, বাগ্দি আমরা, আমাদের ছুঁতে নেই।

স্ত্রীর মুখের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রূপো বলিল—সে কি আমাদের সে রকম মেয়েরে পদ্মরাণী?

—তবে সে আর এখন আসে না কেন? এতবার বলে আসছি...

—মন এখন তার সেখানেই পড়ে গেছে পদ্ম,...ছেলে মানুষ, পাঁচটা ছেলের সঙ্গে খেলা ধূলোতেই কাটিয়ে দেয়।

—আজ উমা বলেই খেলা ধূলোয় ভুলে থেকে আসতে চায় না, আমার সে দু'টো যদি আজ বেঁচে থাকত......

স্ত্রীর এই কথাটুকুর ভিতর দিয়া কতখানি অভিমান মিশ্রিত কান্না নিংড়াইয়া বাহির হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, রূপো বলিল—ছেলে মানুষের ওপর কি এমন করে দুঃখু করতে হয় পদু?...মিছে দুঃখু করিস নি। তুই বরং যা একবার দেখে আয়।

স্বামীর এত কথাতেও পদুর প্রাণে কিন্তু এতটুকু শান্তি ফিরিয়া আসিল না। চক্ষের সামে এইটাই মূর্ত্তিমান আশঙ্কার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—উমা তাহার স্বরূপ বুঝিয়া হয়তো তাহাকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে!......

পদুর মর্ম্মান্তিক বেদনা বুঝিতে পারিয়া রূপো বলিল—যা পদু! দেখে আয় তবে......

হাসিয়া পদু বলিল—উমা যদি আমায় ভুলতে পারে, তবে আমিই কি ভুলতে পারবনা মনে করেছিস? খুব পারব—খু-উব,...সেখানে আর যেতে হবেনা।......

স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ খানাকে ভরাইয়া রূপো বলিল—কতদিন এক-সঙ্গে কাটালুম পদু, তোর মন কি আমি জানিনা? তোর বুকে যে খাণ্ডব-দাহন সুরু হয়েছে, সেটাকে নিভুতে হলে তোকে সেখানে যেতেই হবে। তাকে দেখ্‌বার জন্যে আমারও প্রাণটা কেমন হয়ে উঠেছে, চল্‌ দুজনেই যাই।...

উমাকে দেখিতে যাইবার বাসনাটাকে সহস্র প্রকারে চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও, রূপোর জেদে সে আর আঁটিতে পারিল না, দরজায় চাবি বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই, রূপো বলিল—খাবারের ঠোঙাটা হাতে করে নে পদু! তার আশার জিনিষ।

এই দুই স্বামী স্ত্রী যখন গাঙ্গুলী-বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন রাসবিহারী, পদ্মর বাড়ীতে না যাইবার জন্য কন্যাকে স্নেহ-তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন আর পিসিমা জয়ন্তি, উমার স্বপক্ষে কত কথাই বলিয়া তাহাকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিতেছিলেন।

পদ্ম ডাকিল—উমা!

রূপো ডাকিল—মায়িরে মায়ি! আয়—খাবার এনেছি।

ঠাকুরমার কোল হইতে উঠিয়া, উমা শক্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। পদ্ম ডাকিল—আয় মা আয়, আমি যে তোর মা—আয় খাবি আয়!

উমা ঠিক নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মতই দাঁড়াইয়া রহিল।

গাঙ্গুলী বলিলেন—তোর মা, তোর কালি-দুর্গা-সরস্বতী—স্বর্গের দেবী তোকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে মা—যা!......

উমা আর থাকিতে পারিল না—দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রূপো ডাকিল—আয় মা! আয়—আজকের দিনটে......তাহার দুই চক্ষুদিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইয়া পড়িল, পদ্মর হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটা পড়িয়া গেল। চক্ষের জলে বুক ভিজাইতে ভিজাইতে পদ্ম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল; রূপো তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চল্ পদ্ম বাড়ী চল্!......

দুই জনে মাতালের মত টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল।

* * * * *

* নিজের কৃতব্যবহারের কথা সমস্ত রাত্রি আলোচনা করিয়া,

প্রত্যূষে ঠিক পাগলেরই মত পদুর গৃহ-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া উমা ডাকিল—মা—ও মা—মা !......

কোনও উত্তর আসিলনা !

তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা ঠেলিতেই, কপাট খুলিয়া গেল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যখন তাহাদের ভাঙ্গা বাক্সটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না, তখন সে নির্জ্জীব অবসন্নের মতই বসিয়া পড়িল। পিতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ব্যগ্র চঞ্চল কণ্ঠে বলিল—এরা সব চলে গেছে বাবা ! ঘরে কিছুই ত নেই !...

গাঙ্গুলী মূক স্তম্ভিতের মতই সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সমাপ্ত

প্রীতিকর নির্ম্মল উপহার আর কোথাও পাইবেন না।—সুখের বাসর আগাগোড়া সুখে ভরাইয়া দিবে, প্রাণে আনন্দের বহু বেগধারা বহাইবে। ইহার তুলনা নাই। গল্প করিয়া বলিলে, এই সুনিপুণ লেখিকার অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় কিছুই দেওয়া চলে না।—সামান্য কয়েক মাসে সুখের বাসরেরও ১ম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে! দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার শোভা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে!.........

---

(৪) পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

"গরীবের মেয়ে" (২য় সংস্করণ) ১৲

নারায়ণচন্দ্রের বই,—তা আবার মূল্য একটি টাকা, সুতরাং অবিলম্বে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আশ্চর্য্য হইবার নাই। আমাদের এই উপন্যাস-রস-গ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যিনি নারাণ বাবুর বই পড়েন নি।...গরীবের মেয়ে—সুরবালার অন্তর্নিহিত স্বামীপ্রেম, ঐকান্তিক দৃঢ়তা, সংযম, এ সকল লিখিয়া বোঝানো যায় না।—নিজে উপভোগ করিতে হয়।

আমাদের এমন কোন সাজানো কথা জানা নাই,—যাহা দিয়া অমূল্য সম্পদ, কথা-সাহিত্যের মুকুটমণি 'গরীবের মেয়ে'র বিস্তৃত পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি! এক কথায় বইখানি বাস্তবিকই লোভনীয়!

মাসিক বসুমতী-সম্পাদক,—বহুদর্শী, সুনিপুণ লেখক

(৫) পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু লিখিত—

"পরাজয়"—১৲

আজপর্য্যন্ত এরূপ নূতনত্ব কোন সাহিত্যিকই দিতে পারেন নাই। সত্যেন্দ্রবাবুর উন্নতভাব, গভীর চিন্তাশীলতার সহিত একটির পর একটি করিয়া ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ করিবার কৌশল,—পরাজয় পড়িলে প্রত্যেকেই নিমেষে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমাদের বলিবার

তরুণ শিল্পী

২১। শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত—

"আহুতি"—১৲

পরার্থে জীবন বলি দিতে যায় সকলের আগে কে?—না নারী!—স্বামী সুখের জন্য আপনার সারা জীবনকে ব্যর্থতার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চোখের জল দিয়া হাসিকে আবাহন করে কে?—না নারী!—ঘর-সংসার, সমাজ মন্দির তীর্থ—দেশ বিদেশ—সর্ব্বস্থানের সকল মাধুর্য্যকে জয়যুক্ত করিয়া রাখে কে?—না নারী! এম্‌নি এক নারী তার স্বামী-সুখ-যজ্ঞে আপন সাধ আহ্লাদ এমন কি সারা জীবনের শান্তি পর্য্যন্ত পূর্ণাহুতি দিয়াছিল,—সেই উপাখ্যান লইয়া 'আহুতি' বিরচিত হইয়াছে।

২২। শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত—

"ঝরা-ফুল"—১৲

"অশ্রু মাখানো নিহিত এ ব্যথা—
কেমনে তোমারে জানাবো গো!"

ঝরা-ফুলের নায়িকার দুঃখে পাষাণ গলে বনের পশু পাখীতেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না! সমাজ-লাঞ্ছিতার এই—"সাধ না মিটিল আশা না পূরিল"—কাহিনী পাঠ করিলেই বুঝিবেন—দুঃখ শুধু নায়িকারই নয়—নায়কও সারা জীবন ধরিয়া মর্ম্মভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেহাগের সুরে গাহিয়াছেন—'প্রাণের পথ বেয়ে গিয়েছে সে গো!'

২।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

বিখ্যাত নাটক—মিসরকুমারী রচয়িতা, স্বনামখ্যাত লেখক

২০। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত—

"বড়ঘরের মেয়ে"—১৲

"আমার নয়ন কোণে কালো কাজলের রেখা—
ধুয়ে যায় নয়ন জলে,
নিতি আসে নিশিথিনী ঘুমের পসরা ল'য়ে
নিতি ফিরে যায় বিফলে।"

—এই গানও বরদাবাবুর,—"বড়ঘরের মেয়ে"ও বরদাবাবুর।—গানের সঙ্গে বইয়ের অবিকল সামঞ্জস্য আছে।...একই পিতৃ-পিতামহের বংশসম্ভূত হইয়া, একই রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া, একের প্রতি অন্যের যে নিদারুণ কর্ত্তব্য আছে, এবং তাহা এই পৃথিবীতেই দেখাইতে হয়,—'বড়ঘরের মেয়ে'তে এ কথার তীব্র সমালোচনা ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। ইহা দুইটি চির দুঃখী হৃদয়ের মিলনাশার ব্যাকুলতা আঁকা,—একটি মহিমময়ী সাধ্বীর অন্তর্নিহিত ব্যথা ও জমাট-বাঁধা অশ্রুর প্রবাহ!—বড় সুন্দর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী!

———

১৬। সুসাহিত্যিক—শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত—

হিঁদুর বউ"—১৲

অন্তরের তেজস্বীতা এবং চরিত্রের উন্নত সম্পদ লইয়া হিঁদুর ঃ কিরূপে স্বামীচিত্তে প্রেমের দাগ বসাইতে পারিয়াছিল, কিরূপে বিপু আন্তরিকতায় আশৈশবের চিরসাথী এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবত স্বামীকে পিচ্ছিল পথ হইতে উদ্ধার করিয়া, মন্ত্র-মুগ্ধের মতই অঞ্চলের নিধি করিয়াছিল,—এবং কেমন সুমধুর গুণের মহিমায় বিধর্ম্মী রমণীকে পর্য্যন্ত হিঁদুয়ানীর মর্য্যাদা এবং মাধুর্য্য দেখাইয়াছিল—তাহার জ্বলন্ত উপাখ্যান পাঠ করুন।

১৭। শ্রীযুক্ত সত্যকুমার মজুমদার বি, এল, প্রণীত—

"বৌদিদি"—১৲

Man is not for himself but for others.....

এই কথাটি 'বৌদিদি'র নায়ক-নায়িকা চরিত্রপাঠে বিস্তারিত উপলব্ধি হয়। একনিষ্ঠতা ও দেশ-প্রাণতার সহিত স্নেহের অপরূপ সংমিশ্রণ যে কত মধুময়, "বৌদিদি"ই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইহার গল্পাংশ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবল চিত্তাকর্ষক এবং যথেষ্ট সুরুচি-পূর্ণ। কলেবর সুবৃহৎ।